স্মৃতিসৌধে

– এম. হক চৌধুরী

মৌ–এর সঙ্গে আমার পরিচয়। আজ থেকে কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় বন্ধুত্বের আহ্বান জানিয়ে লেখা পাঠাই। এবং কিছুদিন পর সে লেখাটা পত্রিকায় প্রকাশ হলে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আমার ঠিকানায় চিঠি পাঠায়। এর মধ্যে মানিকগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম থেকে পাঠানো মৌ–এর চিঠিটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম।

সেও চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলো। এবং বিস্তারিত জানিয়ে উত্তর দিল।

এভাবে শুরু হলো চিঠি আদান–প্রদান। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন দেখা করলাম। কথা হলো। বুঝলাম চিঠির ভাষার চেয়ে সুন্দর তার মুখের ভাষা। অবাক হলাম তার সরলতায়।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ফোন, দেখা করার জন্য। পরের দিন দেখা করলাম। তবে যেখানে দেখা করলাম সেখানে বসে কথা বলার মতো কোনো পরিবেশ নেই। তাই বললাম, চলো সাভার স্মৃতিসৌধে যাই। সেখানে সুন্দর পরিবেশে বসে গল্প করবো।

সে রাজি হলো। বাসে করে গেলাম। স্মৃতিসৌধে পৌছালাম বেলা বারোটায়। ভেতরে দেখলাম, লোকজন খুব কম। আমরা ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলাম চারপাশ। তারপর হাটতে হাটতে স্মৃতিসৌধের পেছনের রাস্তার মাঝামাঝি এসে রাস্তার পাশে বসলাম।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর মৌ তার ব্যাগ থেকে একটি কৌতুকের বই বের করে দিল।

দুজনে মিলে বই পড়ছি, হাসাহাসি করছি।

এভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ দেখি চার পাচজনের একটি পুলিশের দল এই রাস্তা দিয়ে আসছে। ভাবলাম, জাতীয় একটি স্থান, এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হয়তো পুলিশ নিয়োজিত। যাক, আমরা আগের মতোই বই পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের এই দল আমাদের কাছে এসে দাড়িয়ে পড়লো এবং আমাকে একজন পুলিশ বললো, এদিকে এসো।

উঠে এলাম।

আমাকে কয়েক হাত দূরে নিয়ে গেল এবং এদের মধ্যে একজন বললো তোমার নাম কি, বাবার নাম কি, বাড়ি কোথায়।

নাম বলার পর তিনি খাতা বের করে লেখছেন। বললাম, স্যার, কি হয়েছে। খাতায় নাম ঠিকানা লিখছেন কেন।

তার সঙ্গের পুলিশটি বললো, থানায় গেলেই বুঝবে।

এদিকে পেছনে ফিরে দেখি কাছাকাছি কোথাও মানুষ নেই। বললাম, আমাদের অপরাধ কি?

তখন একজন বললো, স্মৃতিসৌধের পেছনের রাস্তায় চলাফেরা নিষেধ।

বললাম, তেমন কোনো লেখা সাইনবোর্ড তো নেই। তবুও যদি ভুল হয় প্রথমবারের মতো আপনাদের ছেলেমেয়ে ভেবে ক্ষমা করে দিন।

কিন্তু না, কোনো অনুরোধ কাজে এলো না। তারা মোটা অংকের টাকা চাইলো। এমনকি ভয়–ভীতি দেখালো। এদিকে মৌয়ের চোখ জলে টলমল। কি করবো! বাধ্য হয়ে তাদেরকে টাকা দিয়ে মুক্ত হতে হলো।

সেদিনের সেই স্মৃতি আজও আমাকে খুব কষ্ট দেয়। যখনই কোথাও স্মৃতিসৌধের ছবিটি দেখি তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনের করুণ অসহায় মুহূর্তটি। তাই আমার প্রিয় যায়যায়দিনের *ভালোবাসা*–র সংখ্যা

মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করবো, আমার মতো কেউ যেন তার প্রিয়জনকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হয়রানির শিকার না হয়। সেদিকে নজর দেয়ার প্রত্যাশায়।

ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ থেকে

মাস্তানি

– সাজিয়া

ফিলিপসস্যারের বাসায় ইংলিশ কোচিং করতে গিয়ে তিথির সঙ্গে পরিচয়। আলাদা স্কুলে। কিন্তু উভয়েই ক্লাস টেনে পড়তাম। তিথি খুবই শান্ত টাইপের মেয়ে। পরিচয়ের শুরুতেই জানতে পারলাম তার কোনো ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নেই। কেন জানি না, মনটা ভীষণ খারাপ হয়েছিল।

কাছাকাছি বাসা থাকার কারণে আমরা দুজনে এক সঙ্গে স্যারের বাসায় যাতায়াত করতাম। এভাবেই দুজনে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে গেলাম। এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। হঠাৎ করে তিথিদের বাসার বাড়িওয়ালার ছেলে পলাশ প্রেমের প্রস্তাব দিল তিথিকে। কিন্তু তিথি তাকে কোনো পাত্তা দিল না। কারণ সেই ছেলে পড়াশোনা না করে মাস্তানি করে বেড়াতো। ধীরে ধীরে সেই ছেলের ডিস্টার্ব করা গুরুতর রূপ নিল।

তিথি এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করে ভালো একটা কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু তিথি স্যারের বাসা, কলেজ, বেড়াতে যেখানে যেতো সেখানেই পলাশ পিছু পিছু যেতো। তারপর তিথি এইচএসসি পাস করার পর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো। কিন্তু পলাশ সেখানেও ডিস্টার্ব করতে শুরু করলো। যদিও আমাদের মাঝে সব সময় ফোনে যোগাযোগ হতো এবং আমি তাকে প্রায়ই মনে শক্তি যোগাতে চেষ্টা করতাম। কতোদিন সহ্য করা যায়!

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ডিস্টার্ব করে বলে তিথি অন্য একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। তিথির আব্বা-আম্মা মানে খালা-খালু এই বাসা ছেড়ে দিয়ে আশপাশে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এই পলাশের জন্য তাও সম্ভব হচ্ছিল না। আর তার ছোট দুই ভাইয়ের স্কুলের সমস্যার কথা ভেবে তারা সহ্য করছিলেন। পাড়ায় তিথির নামে আজেবাজে গুজব ছড়ানো হলো। রাগে, অভিমানে খালু হঠাৎ করে আমেরিকাবাসী এক ছেলের সঙ্গে তিথির বিয়ে ঠিক করে ফেললেন।

তিথির অমতেই বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হলো। আমরা কেউ ছেলে দেখি না। আর ছেলে তাড়াতাড়ি আমেরিকা চলে যাবে বলে খুব অল্প সময়ে সব কিছু করতে হবে। তাই হলুদ পর্ব যার যার বাসায় হলো। তিথির হলুদ তার এক চাচার বাসায় হলো যাতে পলাশ কিছু করতে না পারে। এভাবেই বিয়ের দিন চলে এলো। এবং বিয়ের সব অতিথি খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ করে বর দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। বিকাল চারটা বেজে যাচ্ছে, অথচ বরপক্ষের কোনো দেখা নেই। আমরা গেট ধরবো বলে সব আয়োজন করে দাড়িয়ে আছি। আসল ঘটনা হলো তিথির বিয়ে কোন কমিউনিটি সেন্টারে হচ্ছে পলাশ সেটা জেনে যায় এবং বরপক্ষের গাড়ি যখন সেন্টারের কাছাকাছি আসে তখন সেই ছেলে তার মাস্তান বন্ধুদের দিয়ে বর এবং বরের ফ্যামিলিকে ভয় দেখায় এবং দিনের আলোয় ফাকা গুলি ছুড়ে বলে, বরকে মেরে ফেলবে।

ব্যস, বরপক্ষ ফিরে যায়।

এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ঘটনা হয়েছে যা লিখে শেষ করা যাবে না। একটা মেয়ের জীবন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল। কারণ বিয়ের স্টেজে বৌ সেজে বসে আছে কনে আর তার বিয়ে ভেঙে যাওয়া।

হায়রে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা! সবাই সব কিছু জেনে তিথিকেই খারাপ বললো। তিথি নরম টাইপের মেয়ে বলে এই ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই তাকে অকালে চলে যেতে হলো, সিমি রুমী, আরো হাজারও মেয়ের মতো।

পলাশ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ কিছু বলছে না। কারণ খালু পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে বলে থানা–পুলিশের কাছে যাননি। আমি খুব ভালো একটা বান্ধবী হারালাম চিরতরে। এখনো মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে তিথির কথা খুব মনে পড়ে তখন মনে হয় এই মাস্তানি ভালোবাসার কি কোনো প্রতিকার নেই?

নারিন্দা, ঢাকা থেকে

বাধা

বয়

হঠাৎ করেই আমার এক কাজিন আমাদের বাসায় এসে হাজির। সত্যি অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা। কোনো খবর না দিয়ে এমন করে চলে আসবে তা আমি কেন, আমরা কেউই কল্পনা করিনি। তাকে সেই কবে দেখেছি তা মনে করতে পারছি না।

সেই ছোট থেকে দেখে আসছি আমাদের সকল ফুপু ও কাকা ঈদুল ফিতর গ্রামের বাড়িতে করতেন। ফলে বছরে এই দিনগুলোর জন্য আমরা ছোটরা অপেক্ষায় থাকতাম। কিন্তু মাঝে বেশ কিছু বছর বিভিন্ন কারণে সবাই এক সঙ্গে হতে পারছিলেন না। ফলে যোগাযোগ কিছুটা কমে যায়।

এতোদিন পরে এলেও সে সবার হাসি ঠাট্টায় যেতে উঠেছে। কিন্তু আমার দিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে সে দেখেও না দেখার ভান করছে। অথচ আমিও এগিয়ে যাচ্ছি না তার সঙ্গে কথা বলতে। আমার ঠেকা নাকি যে তার সঙ্গে প্রথম কথা বলবো!

শুরুটা এভাবে অভিমান দিয়ে হলেও এখন আমরা দুজনে খুবই ঘনিষ্ঠ। সে আমাদের এখানে এক সপ্তাহ ছিল। এই অল্প কিছুদিনের মাঝেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। এবং তাকে এ কথা জানালে সে চুপ হয়ে থাকে। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ এ কথা ভেবে তাকে ভালোবাসতে থাকি।

গত তিন বছর যাবৎ আবার আগের মতোই সবাই এক সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে ঈদ করছি। ফলে বছরে একবার করে দেখা হচ্ছে। এ সময়টির জন্যই অপেক্ষা করি সারাটি বছর। আমরা সবাই মিলে যখন এক সঙ্গে আড্ডা দিই তখন আমার চোখ তাকে দেখতে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে দুজনার দৃষ্টি এক হয়ে গেলে সে লজ্জায় মাথা নিচু করে নেয়।

আড্ডা, হই–চই, খুনসুটি করেই চলে যায় ঈদের পাচ ছটি দিন। সবাই চলে যার যার স্থানে। বিদায়ের মুহূর্তগুলো সবচেয়ে খারাপ লাগে। বিশেষ করে পরের কয়েকদিন কোনো কাজে মন বসাতে পারি না। আবার কবে দেখা হবে সেই অপেক্ষায় থাকি।

এবারের ঈদে সবাই যখন টিভি দেখায় ব্যস্ত তখন রান্নাঘরে দেখি আম্মা একাই। আম্মাকে আমার পছন্দের কথা বললে তিনি সরাসরি না করেন। বলেন, কোনোদিনই এ সম্পর্ক হতে পারে না।

আম্মার এ কথা শুনে আমার সাজানো স্বপ্নগুলো চুরমার হয়ে গেল। আম্মার কোনো কথা না বলে পুকুরঘাটে চলে এলাম। বাধানো ঘাটে শুয়ে আকাশের তারাগুলোকে দেখতে আমার মতোই নিঃসঙ্গ লাগছে। আমাদের স্মৃতিগুলো ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি! মাথায় কারো হাতের ছোয়ায় চোখ মেলে দেখি আমার মা। আমার চোখ খোলা দেখে তিনি বললেন আমার সঙ্গে রাগ করেছিস, না। খেতে আয়, রাত অনেক হয়েছে। ঠাণ্ডায় শুয়ে আছিস, ঠাণ্ডা লাগছে তো।

তুমি যাও, আমার ক্ষিধে নেই।

আমার কি দোষ? তোর বাবাকে তোদের কথা অনেক আগেই বলেছিলাম। কিন্তু তোর বাবা কিছুতেই এই সম্পর্ক মেনে নিতে চাননি।
বাবা তো আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এখন এই সামান্য চাওয়াটুকু পূরণ করতে পারবেন না। প্লিজ মা, তুমি একটু বাবাকে বোঝাও।
তোর বাবাকে তো তুই চিনিস।
তবুও একটু চেষ্টা করো না, প্লিজ।
আচ্ছা, আমাদের চাওয়া–পাওয়া, পছন্দের কোনো দামই কি নেই? আমি বুঝতে পারি না আমাদের এই সম্পর্ক মেনে নিলে বাবার এমন কি ক্ষতি হবে?
মাকে বললাম, এখানে একটু বসবে?
মা আমার মাথার কাছে বসলেন। এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।
অন্ধকার রাত। তবুও কুয়াশার চাদর দেখা যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে নিশাচরের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আর আমরা দুটো প্রাণী নিজ নিজ চিন্তা জগতে বিচরণ করছি।
হঠাৎ বাধ ভাঙা জোয়ারের মতো করে চোখ থেকে পানি পড়ে মায়ের কাপড় ভিজতে থাকলো।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ময়মনসিংহ থেকে

নীল নকশা

– ফরহাদ হোসেন

তিন বছর আগের কথা। তখন বিবিএ অনার্স করে এমবিএ করার জন্য বিদেশে যাওয়ার তোড়জোড় করছি। হঠাৎ একদিন বাবা তার ঘরে ডেকে পাঠালেন। সাধারণত গুরুতর কোনো ব্যাপার হলে তিনি এ রকম ডেকে আনেন। তার কথার সারমর্ম হলো, তিনি চান আমি ঢাকায় এমবিএ কমপ্লিট করে যতো শিগগিরই সম্ভব আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় যোগদান করি।
শুনে আমার মন খারাপ হলো। রাতে বিছানায় শুয়ে এ নিয়ে ভাবতে লাগলাম। পরে চিন্তা করলাম, পিতা–মাতা যা করেন তা ভেবে–চিন্তে ও সন্তানের মঙ্গলের জন্যই করেন।
ঢাকায় এক শীর্ষ স্থানীয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। আমি উঠলাম জামাল আংকলের বাসায় যিনি আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেহেতু ক্লাস ছিল সন্ধ্যায় সপ্তাহে তিন দিন, তাই আংকল প্রস্তাব দিলেন, ইচ্ছে করলে দিনে আমি তার অফিসে *একসিকিউটিভ অফিসার* পদে চাকরি করতে পারি। আর এ জন্য মাস শেষে পাচ অংকের সম্মানী পাবো।
আমি তো খুশিতে আটখানা! একে তো জীবনের প্রথম চাকরি, তার উপর বোনাস স্বরূপ ইউনিভার্সিটির সুন্দরী তরুণীদের মায়াবী মুখগুলো দেখার সুযোগ।
দোতলা বিশাল বাড়ির নিচ তলার একটি রুম আমার জন্য বরাদ্দ হলো। চমৎকার এসি রুম, মেঝেতে টাইলস, পড়ার টেবিল, কম্পিউটার সবই আছে। শুধু নেই কথা বলার সঙ্গী। রাতে খাবার পর বিছানায় আধশোয়া হয়ে ভাবছিলাম বাসার সবার কথা। মন খুব খারাপ।
হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক শব্দ, আসতে পারি?
অবশ্যই।
দেখলাম হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে একজন অনিন্দ্য সুন্দরীর প্রবেশ।

আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আমি মিথিলা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। ইকনমিক্স ফার্স্ট ইয়ার। নিন। আম্মা পাঠিয়েছেন, দুধটুকু খেয়ে নিন। বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আংকলের দুই মেয়ে। ঐন্দ্রিলার বিয়ে হয়ে গেছে আর মিথিলা ছোট মেয়ে। কোনো ছেলে নেই।

আমার দিন কাটতে লাগলো অনেকটা রোবটের মতো। সকাল নয়টা থেকে পাচটা অফিস। আবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা এমবিএ ক্লাস। পড়াশোনার ভালো চাপ আছে। গ্রুপ স্টাডি, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি করতে করতে হাপিয়ে উঠেছি। মিথিলার সাথে কথা হতো খুব কম। তার *আড়ষ্টতা* আমার মনে হতো তার অহংকার। আবার এটাও হতে পারে, ছেলেদের সঙ্গে সে সহজ নয়। তবে তার একটা দিক খুব ভালো লাগতো। সে ধার্মিক, নিয়মিত নামাজ পড়ে এবং মাথায় সব সময় ওড়না থাকে। সব সময় পবিত্র পবিত্র ভাব।

এভাবে মাস দুই কেটে গেল। এক রাতে শুনলাম আন্টি আর আংকল দুই সপ্তাহের সফরে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন তাদের বড় মেয়ের কাছে। মিথিলা যেতে পারছে না। কারণ, সামনে মিডটার্ম পরীক্ষা। পৃপারেশন নিতে হবে। এ কদিন মিথিলার নানি থাকবেন বাসায়।

আন্টি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার জন্য কি আনবেন।

ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের দুটি বই আনার জন্য বললাম যদি পাওয়া যায়।

এয়ারপোর্টে বিদায় দেয়ার পর আমি আর মিথিলা ফিরছিলাম। মিথিলা একটু পর পর চোখের পানি মুছছে। বোধ করি এই প্রথম তার বাবা মা ছাড়া একা থাকা। নীরবতা ভেঙে সে বললো, আজ বাসায় থাকুন না, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

সরি মিথিলা, অফিসে জরুরি মিটিং আছে। তাছাড়া আংকল নেই। সন্ধ্যায় আসবো।

ওর মুখ দেখে মনে হলো রাগ করেছে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। বাসায় এসেই মিথিলার অভিমান ভাঙাতে হবে।

সন্ধ্যায় ক্লাস শেষে যখন বাসায় ঢুকলাম তখন রাত দশটা। শরীর খুব টায়ার্ড। বিছানায় শরীর এড়িয়ে দিলাম জুতাসহ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ মাথায় একটা কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুললাম।

তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আসুন। টেবিলে খাবার দিয়েছি। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তুমি খাওনি?

না, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

খাবার মেনু দেখে বেশ অবাক হলাম। খিচুড়ি, ইলিশ ভাজা, আলুর চপ সবই আমার প্রিয়।

আমি রান্না করেছি। কেমন হয়েছে? মিথিলা খেতে খেতে বললো।

একসিলেন্ট। কিভাবে জানলে এসব খাবার আমার প্রিয়?

বলবো না। রহস্যের হাসি হাসলো। মিথিলা। পরক্ষণেই বললো, চিটাগাংয়ে আন্টিকে ফোন করে জেনেছি।

ওহ, তাই বলো।

বুঝতে পারছিলাম না, আমার প্রতি তার এই দরদ কি একাকীত্ব থেকে, নাকি খাটি ভালোবাসা থেকে নিঃসৃত। খাবার শেষ করে ছাদে গেলাম পূর্ণিমার চাদ দেখার জন্য।

আমাকে অবাক করে দিয়ে মিথিলা ছাদে এলো দুকাপ চা নিয়ে।

আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।

মিথিলার নানি হয়তো ভুল বুঝবেন।

মিথিলা, তুমি কষ্ট করে চা বানাতে গেলে কেন, কাজের লোকদেরও বলতে পারতে।

ওর হাসিমাখা মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

না, পারতাম না। কারণ, যাকে পছন্দ করি তার জন্য সব কিছু করতে পারি আমি, চা বানানো তো সামান্য কাজ! এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেলো সে।

এক অদ্ভুত ভালোবাসার মোহ ছড়িয়ে পড়লো আমার দেহমনে। বুঝতে পারলাম, আমাদের দুজনের মধ্যে রসায়ন কাজ করছে এবং সেটা হচ্ছে ভালোবাসার রসায়ন।

পরদিন আমরা গেলাম *ফ্যান্টাসি কিংডমে।* রোলার কোস্টারে চড়ার সময় মিথিলা ভয় পেয়ে আমাকে প্রচণ্ড আকড়ে ধরেছিল। তার নখের দাগ এখনো আছে আমার হাতে।

রাতে গুলশানের টপকাপি রেস্টুরেন্টে ক্যান্ডল লাইট ডিনারে খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম কেন সে আমাকে প্রথমে এড়িয়ে চলতো।

মিথিলা বললো, প্রথম থেকেই আমাকে তার ভালো লাগতো। যদি আন্টি, আংকল জেনে যায়, স্রেফ এ ভয়েই সে আমাকে এড়িয়ে চলার অভিনয় করতো।

আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে পছন্দ করো না, অহংকারীও বটে!

আপনার সঙ্গে কথা বলবো না। কপট রাগ দেখায় মিথিলা।

সুন্দরীদের তো অহংকার থাকবেই আর তুমি হলে অনিন্দ্য সুন্দরী!

একটু চুপ থেকে সে আস্তে আস্তে বললো, শুধু একজনের চোখে সুন্দর হলেই আমি খুশি। তার নাম দহারফ।

মানে?

মানে গাধা একটা। উল্টো করে পড়ুন।

এভাবে ভালোলাগা, ভালোবাসায় প্রতিটি দিন পার হতে লাগলো।

একদিন অফিসে আংকল নিজের ঘরে ডাকলেন। বললেন, তুমি ঢাকায় এসেছো পড়তে। এ মুহূর্তে অন্য কিছু করো তা আমরা বা তোমার পরিবার কেউ চায় না। কারণ, তাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে।

আংকলের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব সুলভ কথাগুলো শুনে খুব লজ্জা পেলাম। এবং মাথা নিচু করেই প্রতিজ্ঞা করলাম, নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা বোধ বিসর্জন দেবো না, এই ভালোবাসার কথা, যে ভালোবাসা এখন উভয় পরিবারের মাঝে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক নষ্ট করবে।

অনেকটা নিজের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই অন্য বাসায় উঠলাম – ডিওএইচএস–এ কয়েকজন ক্লাসমেটের সঙ্গে। যদিও আন্টি, আংকল অনুরোধ করেছিলেন থাকার জন্য। আমি যুক্তি দেখালাম পড়ার সুবিধা হবে। তবে চাকরি ছাড়লাম না।

মিথিলা মাঝে মধ্যে আমাকে মোবাইলে ফোন করে কাদতো।

নিজের কষ্ট চেপে রেখে তাকে প্রবোধ দিতাম আমার চেয়ে ভালো ছেলেই তার বর হবে।

এই প্রবোধ শুনে রাগ করে সে একদিন ফোন রেখে দেয়।

সব সময় তাকে বলেছি, ধৈর্য ধারণ করতে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে।

দেখতে দেখতে আমার এমবিএ শেষ হলো। সব কিছু গুছিয়ে তল্পিতল্পাসহ চট্টগ্রামে যাওয়ার আয়োজন করছি। আংকল ফোন করলেন একদিন। এবং রাতে বাসায় ডিনার খাওয়ার জন্য বললেন। ভাবতে লাগলাম ভালোই হবে। মিথিলার সঙ্গে দেখা হবে অনেক দিন পর। হয়তো তার কিছুদিন পর তার বিয়ে হয়ে যাবে। তার মায়াবী চাহনি, দুষ্টুমি–অভিমান এগুলো আরেকজন উপভোগ করবেও। চিন্তা করতেই মাথা দপদপ করে ওঠে।

নতুন কেনা সুট পরে রাতে গেলাম মিথিলাদের বাসায়। আমি তো অবাক! অনেক আত্মীয়–স্বজন, তাছাড়া আমার বাবা–মাও চট্টগ্রাম থেকে হাজির। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার!

কিন্তু আমার বাবা–মা মুচকি হাসলেন, কিছু বললেন না।

জামাল আংকল তার স্টাডি রুমে ডেকে একপাশে বসালেন আমাকে, অন্য পাশে মিথিলা। গোলাপি শাড়িতে ওকে অপরূপা লাগছে। টেবিলের অন্য পাশে আমার বাবা–মা আর আন্টি।

আংকল বললেন, প্রথমে তোমার আর মিথিলার ভাব দেখে আমরা গররাজির মেকি ভাব করেছিলাম যাতে তোমাদের পড়ালেখার ক্ষতি না হয়। আরো কিছু সামাজিক কারণও ছিল। আমরা দুই ফ্যামিলি তোমাদের বিয়ে ঠিক করেছিলাম আগেই। তবে প্রকাশ করিনি তোমাদের স্বার্থেই। তোমাদের সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যই এ নাটকীয় আয়োজন।

আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি। হেসে বললাম আমি।

তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো, তার পুরস্কার এটি।

আংকল, দ্বিতীয় সারপ্রাইজ দিলেন কম্পানির একসিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে আমার এপয়েনমেন্ট লেটার।

সুযোগ খুজছিলাম মিথিলাকে একান্তে পাওয়া জন্য। সবাই যখন খাওয়া–দাওয়া করছিল তখন তাকে একা পেয়ে দরজা বন্ধ করলাম।

লজ্জায় সে দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছে।

এই দুষ্টু মেয়ে, তোমাদের এই নীল নকশার কথা আমাকে বলোনি কেন? অনুযোগ করলাম আমি।

গত দুদিন খালার বাসায় ছিলাম, আম্মা বললেন অতিথি আসবে। তাই সেজেছি।

উফ বোকা মেয়ে! তুমি আমার জন্য সাজোনি। তাই তোমার দিকে তাকাবো না।

মিথিলার সুন্দর মুখ দুহাত ধরে উঠালাম। তার চোখ বন্ধ, চোখের কোণে পানি। ওর কপালে চুমু দিলাম, তারপর গালে আরেকটা।

মিথিলা যেন কেপে উঠলো। তার পাখির মতো দেহটা আমার ওপর ভর করে ছেড়ে দিল। আর আমার বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কেদে উঠলো। এতোদিন ধরে জমানো ভালোবাসা আটকে রাখার কষ্টগুলো চোখের পানি আকারে বেরিয়ে যায় এই সারপ্রাইজে। হোক না তা সাজানো সারপ্রাইজ।

নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

সুখে থাকো

– সেলিনা আক্তার খান

মোহিত যখন আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেল সুদূর রোম–এ তখন আমার পৃথিবীতে অমাবস্যার ঘনঘটা। আমার দিন কখন হয়, রাত কখন শেষ হয় কোনো কিছুই আমার খেয়ালে থাকতো না। সামনে বিএ পরীক্ষা, পড়াশোনা করতে পারছি না, এ রকম অসময় আমাকে পার করতে হয়েছে।

সে যাবার আগে কতো সহজ করে বলে গেল তুমি কষ্ট পাবে জানি। আমার যে কষ্ট হচ্ছে না, তা নয়। তবুও আমার করার কিছু নেই। আই অ্যাম সরি।

ভাবতেও অবাক লাগে যে, হৃদয়ের গভীরের একটি সম্পর্ক ইংরেজি এক লাইনে শেষ হয়ে যেতে পারে! তার কথায় আমার বলার কিছু ছিল না। তাকে বেইমান বলবো, না, স্বার্থপর বলবো বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কিছুই বলিনি। নিজের কষ্টকে ভাগ্যের কাছে সপে দিয়েছিলাম।

এতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। দীর্ঘ দিন পরে আস্তে আস্তে আমার সহ্য করার ক্ষমতা হলো। আর কোনোদিন কাউকে ভালোবাসতে পারবো কি না তা ভেবে দেখিনি। আমার শুধু মনে হয়েছে, জীবনে যাকে এতো বিশ্বাস করলাম, যাকে ভেবেছি পৃথিবী ধ্বংস হলেও সে আমার পাশে থাকবে সেই যখন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারলো! এখন ভাবি, পৃথিবীর সবাই আমাকে কষ্ট দিতে পারবে।

অবশেষে বিএ পরীক্ষায় অংশ নিলাম। পাসও করলাম। এরপর আমি মাস্টার্সে ভর্তি হই।

মাঝখানে কয়েক বছর গড়িয়ে যায়। আমার থেকে মোহিত অনেক অনেক দূরে। তবুও তাকে ভুলতে পারি না। তার জন্মদিনে আজও ফুল কিনে এনে ফুলদানিতে সাজাই, বন্ধুদের খাওয়াই। কেউ জানে না কেন আমার এ আয়োজন। তাকে মনে পড়ে। কিন্তু কষ্টটা আর আগের মতো লাগে না।

এভাবে যখন কষ্টকে পাশ কাটাতে পেরেছি ঠিক তখনি ২০০১–এ আমার জন্মদিনে তার হঠাৎ আগমন।

তার এ কেমন প্রহসন আজও বুঝতে পারিনি। যাবার আগে জিজ্ঞাসা করলাম, মোহিত, আমায় মনে পড়ে কখনো তোমার ঘুম না আসা রাতে?

সে আমায় জানালো, অবশ্যই মনে পড়ে। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত।

আমার দুচোখ ভরে আবার জলের খেলা। কান্নার সঙ্গে শুধু চোখের জলই পড়ে। হৃদয় ভেঙে আবারও চুরমার হতে শুরু করে। যতোখানি নিজেকে শক্ত করেছিলাম ততোখানিই ভেঙে পড়ি। সে এবারও চলে যায় আমার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে রোমে।

এবারও নিজেকে বোঝাই। এ তেমন কিছু না। কতো মানুষের জীবনেই তো কতো কিছু ঘটে। আমার জীবনেও নাহয় এটা কোনো দুঃখজনক ঘটনা।

কিছুদিন পর কষ্টটা কিছু কমতে থাকে। আল্লাহকে বলি, এ জীবনে যেন তার সঙ্গে আর আমার দেখা না হয়।

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে আবার তার বাংলাদেশে আগমন। এবার উপলক্ষ বিয়ে। আমি জানতাম না যে মোহিত ঢাকায়।

২৫ ডিসেম্বর মোহিতের ফোন। অনেকক্ষণ কথা বলার পরও যখন সে বলছিল না সে কে তখন ফোন রাখতে যাবো হঠাৎ ফোনের ওপ্রান্তে বলে উঠলো, আমি মোহিত।

কথাটা শোনার পর প্রথম আমার মুখ থেকে যে কথাটি বের করলাম তা হলো মোহিত মানে!

জানি প্রশ্নটা বোকার মতো হয়েছিল। আমি তাকে দেখার জন্য আবারও পাগলের মতো হয়ে গেলাম। মনে মনে এও ভাবছিলাম, দেখা না হওয়াই ভালো। কারণ, তাকে দেখার কষ্টের চেয়ে না দেখার কষ্ট সহ্য করতে পারবো।

২৬ ডিসেম্বর বিকেলবেলায় ডোরবেলের শব্দে দরজা খুলে দেখি মোহিত।

আমি আবার পাচ বছর পেছনে চলে যাই। অনেক ধরনের কথা হয়। যাবার সময় তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিই। আমার খুব কান্না পেতে থাকে।

হঠাৎ মোহিত আমার হাতটা ধরে বলে, আমি তো বিয়ে করতে এসেছি জানো বোধহয়, আমার ওপর কি তোমার কোনো রাগ বা অভিযোগ আছে? মানুষের জীবনে অতীতে অনেক কিছুই হয়। তুমি আমাকে অভিশাপ দিও না।

বললাম, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। তুমি সুখী হবে। এ আমার আশীর্বাদ, অভিশাপের প্রশ্নই ওঠে না।

সে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকে।

তাকে বললাম, এবার তুমি যাও, বেস্ট অফ লাক।

মোহিত কিছুটা এগিয়ে এসে বললো, বিয়ের কার্ড দিয়ে যাবো। যাবে তো?

আমি দুহাত জোড় করে মোহিতকে বললাম, এ শাস্তি তুমি আমায় দিও না।

সে চলে যায়।

এবার থার্টি ফার্স্ট নাইট–এ খুব আশা করেছিলাম রাত বারোটা এক মিনিটে হয়তো মোহিত আমাকে একটা ফোন করবে। কারণ, জানতাম নদী শুকিয়ে গেলেও তার রেখা থাকে। বারোটা দশ মিনিটে ও যখন আমাকে

ফোন করলো না তখন আমিই মোবাইলটা নিয়ে বসলাম। কিন্তু আধ ঘণ্টা চেষ্টা করেও নেটওয়ার্ক পেলাম না। বিজি।

আমার চোখে এতো জল থাকে ভাবতেও অবাক লাগে, চারদিকে এতো আতশবাজি, মনে হচ্ছে আমার বুকে ড্রাম পেটাচ্ছে। নিজেকে শান্ত করলাম। মনে মনে বললাম, তুমি সুখে থাকো মোহিত, নতুন বছরে এই হলো তোমার জন্য আমার আশীর্বাদ।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

সারপ্রাইজ

– আলী হোসেন চৌধুরী

হঠাৎ করেই ভাবলাম নমিতাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো। তাকে কিছু না জানিয়ে একেবারে জীবন্ত দেহটা নিয়ে সামনে দাড়াবো। নমিতা অবাক হবে, অপলক চেয়ে থাকবে কিছুক্ষণ, তারপর আমাকে অবশ্যই জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে।

সামনে রয়েছে চায়নিজ নিউ ইয়ারের তিন দিন ছুটি। বসকে পটিয়ে আরো পাচ দিন নিয়ে নেবো। নমিতাকে দেখা বাস্তবায়ন হবে আমারই এক সহকর্মীর সৌজন্যে। তার বাড়ি ওই নমিতার এলাকায়। সিংগাপুর সিটি টু ম্যানিলা। তারপর ট্যাকসিতে চার ঘণ্টার জার্নি পাংগাসিনান প্রদেশ। ঠিকানা তো একেবারে মুখস্থ। গত পাচ বছর ধরে নমিতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কেমন আছে জানি না। জানার ইচ্ছেটা দমন করেছি অনেক কষ্টে। নমিতা যদি জানে তার খুব কাছের একটি দেশে অবস্থান করছি, অথচ তাকে দেখতে গেলাম না তাহলে সে দুঃখ পাবে। তাকে দুঃখ দেয়ার কথা ভাবতেই পারি না।

সহকর্মী রডিগো–কে সব খুলে বললাম।

সে বললো, তুমি যেখানে যেতে চাও তা আমার বাড়ি থেকে এক ঘণ্টার ড্রাইভ। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

২০০২–এর ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে চাংগি এয়ারপোর্ট ছেড়ে ফিলিপিন্স এয়ালাইনের বিশাল বোয়িং আকাশে উড়লো। সিট পরিবর্তন করে আমাকে জানালার পাশে বসতে দিল। বিমানের প্রায় সব যাত্রী ফিলিপিনো। পাখির কিচির–মিচির শব্দের মতো শ শ নারীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ। এই ফিলিপিনো মেয়েরা সিংগাপুরে হাউসমেড–এর কাজ করে দেশে যাচ্ছে ছুটিতে। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক, ঘেষাঘেষি, চোখাচোখি হয়ে গেছে। আমি যে বিদেশি তা বুঝতে কষ্ট হয়নি কারো। তারা তো মুক্ত কয়েদি, ঠিক আমারই মতো। বন্দী খাচা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে আপন নীড়ে ক্ষণিকের জন্য প্রিয়জন দর্শনে।

বিমান উড়ে চলছিল ইন্দোনেশিয়া–র বাতাম–এর উপর দিয়ে। পেছনে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার এক ঋতুর দেশ সিংগাপুর ছেড়ে যাচ্ছি, তিন ঋতুর দেশ ফিলিপিন্স। এখন ওখানে শীতের শেষ দিনগুলো বসন্তকে আহ্বান জানাচ্ছে ঠিক আমারই প্রিয় দেশ বাংলাদেশের মতো।

প্যাসেঞ্জার চার্ট দেখে সুন্দরী এয়ার হস্টেস আমাকে খুজে বের করলো। আমিই একমাত্র মুসলিম যাত্রী। জানতে চাইলো কি খেতে চাই। বললো, হালাল ফুড রয়েছে তোমার জন্য। খাবার প্যাকেট এলো। আবারও জানতে চাইলো কি ড্রিংক নেবো। বললাম, তোমাদের দেশের চিকু জুস।

খাবার খেতে খেতে চলে গেলাম স্মৃতিময় দিনগুলোর পথ বেয়ে ঠিক ঊনত্রিশ বছর আগে।

১৯৭৩ সালের এক শীত বিকেল। ডাকপিয়নের দেয়া চিঠিটির ওপর চোখ পড়লো।

পৃসিলা পৃসি ফেরার নমিতা।

বাকনোনো, বায়োংবাংগ।
পাংগাসিনান।
ফিলিপিন্স।

চিঠিটি খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়লাম। খেয়ালের বশে পত্রমিতালি পত্রিকা থেকে ঠিকানা নিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। জবাবটা এসেছে এক মাস পর। জানতে চাইলো কোথায় পেলাম ঠিকানা। আমি তো বাংলাদেশের পত্রিকায় ঠিকানা ছাপতে দিইনি। এমনকি বাংলাদেশ বলে যে একটি দেশ আছে তা আমার জানাই ছিল না। চিঠিটা পড়ে জবাব লেখার উৎসাহ পেলাম। সে নিষেধ করেনি লিখতে আবার বলেনিও লিখতে। মনে হচ্ছে, আমাকে জানার আগ্রহ তার রয়েছে। সে নিজের কথাও বলতে চায়।

শুরুটা এভাবেই। আমার হিরো মার্কা ছবি পাঠালাম। সেও পাঠালো। মেয়েরা এতো সুন্দরী হতে পারে তা তখন অল্প জানা ছিল। চোখ দুটি ছোট, নাকটা চ্যাপটা, কিছুটা বেটে এক অপরূপ সুন্দরী। ওই ছবিটাই বদলে দিল আমার অনেক নষ্ট অভ্যাস।

আমি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। স্থানীয় কলেজে ছাত্রলীগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, অনেকটা পাতি মাস্তান। মেয়েরা আমাকে দেখলে পালাতো। এতো সুন্দর দৈহিক গঠন, পারিবারিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক চেতনা নিয়েও কোনো মেয়ের হৃদয়ে পৌছাতে পারিনি। কিন্তু অনেক দূরের একটি দেশ, ফিলিপিন্সের এক অপরূপা সুন্দরী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

চিঠি দেয়া–নেয়া চললো। প্রতিটি চিঠিতেই নিমন্ত্রণ থাকে তাদের দেশে যেতে। আমিও লিখি, নমিতা, তুমি দেখবে ঠিক একদিন এসে যাবো। তোমাকে চমকে দেবো।

সে লিখতো, আমি চাই, তুমি এসে আমাকে নিয়ে উড়ে যাও তোমার দেশ বাংলাদেশে। আমি তোমার বুকে মাথা রেখে কাটিয়ে দেবো সারা জীবন।

এর নাম কি প্রেম, ভালোবাসা, শঠতা, নাকি বয়সের ব্যাকুলতা? উত্তর তখন জানা ছিল না।

সে আমার জীবন চলার পথ ও মত বদলে দিয়েছে। ১৯৭৪–এর সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশে স্মরণকালের বড় বন্যার পর দেশ জুড়ে চলছে দুর্ভিক্ষ। ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে মানুষ ও কুকুরের লড়াই চলছে। গাছের লতা–পাতা, কচু–ঘেচু, লঙ্গরখানার নিম্নমানের আটার জাউ খেয়ে বেচে থাকার চেষ্টা করছে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তিন মাস নমিতাকে চিঠি লিখিনি নানান রাজনৈতিক ব্যস্ততায়। মানুষ না খেয়ে মরছে আর আমরা চাদার টাকায় বাজারে বসে ইচ্ছেমতো খাচ্ছি। ডাকপিয়ন এসে বন্ধুদের সামনেই চিঠিটা দিয়ে গেল। চিঠি খুলতেই বিশ ডলারের পাচটা নোট বেরিয়ে এলো। ইউএস ডলার তখনো অনেকে দেখেনি। সঙ্গে দীর্ঘ চিঠি।

সে লিখেছে –
ইমন, টিভিতে দেখলাম তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। অনেক নারী–শিশু না খেয়ে মরছে। কংকালসার দেহ নিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাচ্ছে। আমি তো ছাত্রী। পারিবারিক অবস্থাও ভালো নয়। তাই কলেজের বান্ধবীদের নিয়ে কিছু চাদা, কিছু ফল বিক্রির লভ্যাংশ এবং নিজেদের টিফিনের খরচ বাচিয়ে সামান্য কিছু তোমার কাছে পাঠালাম। তুমি ওই ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে খাবার কিনে দিও।

ডলারগুলো দেখে বন্ধুদের চোখ চকচক করে উঠলো। রিপন বললো, এই মরা আর খরার সময়ে তাজা ডলারগুলো এলো, ডাক বিভাগ এতো সৎ হলো কবে?

আলফাজ বললো – দোস্ত, তারা বুঝতেই পারেনি চিঠির ভেতর ডলার থাকতে পারে।

আমির বললো – *দোস্ত, ডলারগুলো সইত্যা শালারে দিয়া টাকা নে। তারপর চল যাই, বাংলা খাই।*
ডলারগুলো পকেটে রেখে চিঠিটা বের করে তাদের সামনে দিলাম।
নে, হারামজাদার দল পড়ে নে।
রাতে ঘুম হলো না। একশ ডলার চিন্তার রাজ্যে ভীষণ ঝড় তুলেছে। একজন বিদেশিনী তরুণী, বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা দেখে বান্ধবীদের নিয়ে চাদা উঠিয়েছে, ফল বিক্রি করেছে, নিজের টিফিনের টাকা বাচিয়েছে, সময় ও শ্রম ব্যয় করেছে একটি ভিন্ন দেশের মানুষের জন্য। আর আমি? চাদাবাজি করে নিজে খাচ্ছি, অন্যকে দিচ্ছি না।
শত প্রতিকূলতার ভেতর আধমরা বিবেকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আমি কেন ওই বিদেশি তরুণীর মতো হতে পারি না। কেন হইনি, কারা হতে দিচ্ছে না, আর হতে বাধা কোথায়? এসব প্রশ্ন নিজের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে।
ভালো হবার জন্য ইচ্ছেটাই যথেষ্ট। তওবা করলাম সেই রাতে একাকী। একজন ভিনদেশি তরুণী আমাকে দেশপ্রেমিক হবার প্রথম সবক দিল। মনে মনে লজ্জিত হলাম আবার গর্বিতও হলাম।
১৯৭৭ সালে এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম। এদিকে নমিতার চাকরি হলো একটি সাহায্য সংস্থায়, পাশের প্রদেশ মিনদানাউ–এ।

সে লিখলো –
তুমি তো মুসলিম। মিনদানাউ–কে ফিলিপিন্স বলা যায় না। কারণ, এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। এখানে আছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীনতার লড়াই। মুসলিমরা আলাদা হতে চায়। এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম। নদী–খাল, পাহাড়–পর্বত, জঙ্গল এবং অবারিত ফসলের মাঠ। এখানে নূর মৌসরি ও আবু সায়াফ–এর নেতৃত্বের চলছে গেরিলা যুদ্ধ। এমনি জায়গায় কাজ করছি। ইমন, তুমি এসো, আমাকে নিয়ে যাও। কবে নেবে?

আমি লিখতাম, দেখবে ঠিক একদিন হঠাৎ এসে যাবো এবং তোমাকে নিয়ে যাবো। কথাগুলো লিখতাম চিঠিতে। কিন্তু বাস্তবতা কতো কঠিন তা তো নমিতা হয়তো জানে না, আমি জানি। পকেট ফাকা থাকলে ভালোবাসা চলে কখনো? কিন্তু বিয়ে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে পকেট থাকতে হবে পরিপূর্ণ। তা না হলে এক রাতেই ভালোবাসা পালিয়ে যাবে।
১৯৮০–র শেষের দিকে বহু পথ ও অনেক দেশ ঘুরে বেলজিয়াম–এ স্থির হলাম। দেশে টেলিফোন করে জানলাম নমিতার চিঠি এসেছে। অনেক দিন হলো তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। চিঠি দিয়েও জবাব পাইনি। বন্ধুকে বললাম চিঠিটা পড়ে শোনাতে।
নমিতা এক হাজার ইউএস ডলার চেয়েছে। ভীষণ প্রয়োজন। এর আগে দীর্ঘ সময়ের মাঝে সে কিছুই চায়নি কখনো। ওদের কৃসমাস, নিউ ইয়ার, ভ্যালেন্টাইনস ডে আর আমাদের বাংলা নববর্ষ, ঈদ কার্ড ছাড়া অন্য কিছুই বিনিময় হয়নি।
দীর্ঘ দিন যোগাযোগ বন্ধ থাকার পর হঠাৎ এক হাজার ডলার চেয়ে বসলো। প্রতারণা নয়তো? না। তা হতেই পারে না। যে তরুণী হাজার মাইল দূর থেকে নিজের সময় ও শ্রম ব্যয় করে গরিব বাংলাদেশের রাজনৈতিকদের তৈরি দুর্দশা দেখে নিজের সাধ্যমতো সাহায্য পাঠায় সে এমন হতেই পারে না। এমনটা কল্পনা করাও পাপ।
রাতে ঘুমানোর আগে ভাবলাম, কোথায় পাবো ডলার? পায়ের নিচের মাটি তখনো শক্ত হয়নি। পরিচিতের সার্কলও গড়ে ওঠেনি। মনে মনে তিনজনকে টার্গেট করলাম তাদের কাছে চাইবো।

নমিতার টেলিফোন নাম্বারটা সঙ্গেই ছিল। বাংলাদেশ থেকে শত চেষ্টা করেও কোনোদিন কথা বলতে পারিনি টেলিফোনে। পৃথিবীর পূর্ব আর পশ্চিমের সময়ের ব্যবধান ভুলে গিয়ে টেলিফোন করলাম। এই প্রথম। নমিতাই ধরলো। পরিচয় দিতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলো অনুভব করলাম।

বললো, চাকরিটা নেই, এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। কোনোদিন দেখা হলে বলবো। আমি এখন অর্থ কষ্টে আছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি হংকং যাবো হাউসমেড–এর চাকরি নিয়ে। প্রয়োজন এক হাজার ডলার। তুমি কি দেবে?

দেবো, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাচ্ছি।

যে তিনজনকে টার্গেট করেছিলাম তাদের দুজনের কাছ থেকে পেলাম পাচশ ডলার। বাকিজন আতিকের কাছে ডলার নেই। তাকে খুলে বললাম বিষয়টা। সে উৎসাহী হলো। বললো, ভেবো না, ম্যানেজ হয়ে যাবে। সামনে রয়েছে শনি ও রবিবার। ফুল বিক্রি করবে, পারবে না?

অবশ্যই পারবো।

নমিতার ডাকে ঈশ্বর সাড়া দিল। শনি ও রবিবার প্রচুর ফুল বিক্রি হলো। মাইনাস পাচ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শীতের পোশাক পরে দুই বাংলাদেশি ভিনদেশি এক তরুণীকে সাহায্য করার জন্য ফুল নিয়ে ঘুরে বেড়াই বার, পাব পার্ক, বাস স্টপে যেখানে পুলিশের ভয় আছে।

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সেই দুর্যোগ মুহূর্তে নমিতা নামে ভিনদেশি তরুণী আট কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারেনি। কিন্তু তার পাঠানো ডলারে অন্তত আটজন মানুষ খেতে পেরেছে। নমিতাকে সেদিন এক হাজার ডলার পাঠিয়ে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সেরা ভালো কাজটি করতে পেরেছি। এদিকে নমিতাও খুশি হলো, শক্তি পেল নতুন জীবন গড়ার।

নমিতা চলে গেল হংকং। প্রতি রবিবার কথা হতো টেলিফোনে। ফুলের দেশ, সুন্দরী ললনার দেশ বেলজিয়াম থেকেও অনুভব করতাম নমিতার রূপ–গুণ ও সহমর্মিতার কাছে এরা ম্লান।

নমিতা বলতো, ইমন, তোমাকে চাই, কবে আসবে তুমি?

বিমানের সিটে হেলান দিয়ে দুচোখ বন্ধ করে এসব ভাবছিলাম। হারিয়ে যাওয়া টুকরো স্মৃতিগুলো পর পর সাজিয়ে ভাবতে ভালোলাগে। চারপাশে শুরু হয়ে গেল মেয়েলি কণ্ঠের কোরাস। রডিগো–র ঠোট দুটোও নড়ছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বললো, এটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। মেয়েরা দেশে ফিরছে, কতো আনন্দ তাদের।

আমরা এখন ম্যানিলার কাছাকাছি এসে গেছি। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। নমিতা এখন কোথায়, কেমন আছে জানি না। দেখা হলে প্রথমে কি বলবো বা সে কি বলবে এসব ভাবছিলাম।

রডিগো বললো, ইমন, তুমি চিন্তা করো না। তোমার জন্য হালাল ফুড তৈরি করে দেবো। আর কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাবো নমিতার কাছে।

ম্যানিলা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন অফিসার বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেখে একটু নেড়েচেড়ে দেখলো। চোখে সন্দেহ। নাইন–ইলেভেন এ সন্দেহ এনে দিয়েছে।

সিংগাপুরের গ্রিন কার্ড এগিয়ে দিলাম। উল্টে–পাল্টে দেখলো, তারপর সিল মেরে দিল। জানতে চাইলো কোথায় থাকবো।

বললাম, পাংগাসিনান।

মিনদানাউ যেতে চাও?

না।

খোনে যেতে চাইলে আলাদা অনুমতি লাগবে। ছোট একটা ধন্যবাদ দিয়ে পাসপোর্ট আমার হাতে তুলে দিল।

ম্যানিলা থেকে ট্যাকসি ক্যাবে প্রায় চার ঘণ্টার জার্নি পাংগাসিনান প্রদেশের বাকনোনো নামে এক মফস্বল শহর। এই বাকনোনো অঞ্চলটা বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার ভূ–প্রকৃতির সঙ্গে দারুণ মিল রয়েছে। ছোট ছোট খাল, নদী, ঝিল এবং পাহাড়ের মতো উচু টিলা। বাড়িগুলো সাজানো গোছানো এবং একত্রে। প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ, স্যানিটারি, বিশুদ্ধ খাবার পানি, সিলিন্ডার গ্যাস রয়েছে। ওদের মূল ভাষা *তাগালো*। ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। ইংরেজি বর্ণমালা দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে। প্রায় সকলেই ইংরেজি জানে।

আমার আগমনের কথা রডিগো সম্ভবত আগেই জানিয়েছিল। আশপাশের সকলেই জড়ো হলো আমাকে দেখতে। হ্যান্ডশেক ও শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম, মুগ্ধ হলাম তাদের আতিথেয়েতায়।

পরদিন ইঞ্জিনচালিত রিকশা বা ট্রাইসাইকেলে রওনা হলাম দক্ষিণ বাকনোনো–র সিকানো গ্রামে। রডিগো–কে বললাম, আমার পরিচয় গোপন রাখতে। উদ্দেশ্যে, নমিতাকে সারপ্রাইজ দেবো। দেখবো সে চিনতে বা অনুমান করতে পারে কি না।

এক ঘণ্টায় ড্রাইভ মনে হলো এক যুগ। কখন শেষ হবে পথ, কখন দেখবো জীবন্ত নমিতাকে, যাকে দেখার ইচ্ছে পোষণ করছি গত ঊনত্রিশ বছর ধরে।

ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি খুজে বের করতে সময় লাগেনি। পেয়ে গেলাম। পুরনো কাঠের তৈরি মাচা করা বাড়ি। ট্রাইসাইকেল থামতেই মধ্য বয়সী একজন এগিয়ে এলেন। রডিগোর সঙ্গে কথা বললেন।

নিশ্চিত হলাম এটাই নমিতার বাড়ি। চারদিকটা দেখে নিলাম। জানালার পাশে চিকু গাছ। ওই গাছটির কথা নমিতা অনেকবার লিখেছে চিঠিতে। বাড়ির ঠিক পেছনে কর্ন খামার। কাচা হলুদ রঙের কর্নগুলো বাতাসে দুলছে। কিন্তু নমিতা কোথায়?

লোকটি চলে গেলেন।

রডিগো আমার দিকে বিষণ্ন মুখে তাকালো। তার চোখের ভাষায় বলছে, কিছু একটা ঘটে গেছে, নমিতা কি নেই?

লোকটি আবার ফিরে এলেন।

রডিগো বললো, ইনি নমিতার ভাই।

হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলাম। ভালো ইংরেজি জানেন। আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গে।

চোখ পড়লো একটি বড় ফ্রেমে বাধানো ছবির দিকে দেয়ালে ঝোলানো। আমার ছবি। ১৯৭৪ সালের ছবিটা। পাশেই নমিতার বিশাল ছবি, সম্ভবত সেই আমলেরই। রুমটা ভালো করে দেখে নিলাম।

নমিতার ভাইটির নাম ডিরুজ। তার স্ত্রী হালকা খাবার নিয়ে এলো। কলা, চিকু এবং তাজা সামান্য সিদ্ধ কর্ন। ডিরুজ বললেন, তোমার কথা সবই জানি। নমিতা বলতো তুমি আসবে, আসনি। আমার বোন খুব ভালো। থেমে গেলেন। তুমি কি জানো নমিতার বর্তমান অবস্থা?

মাথা নেড়ে বললাম, না। জানি না।

সে এখন হেলথ সেন্টারে রয়েছে, সে এইচআইভি রোগী। দেখতে যাবে?

হঠাৎ বজ্রঘাতে মানুষ কেমন হয় জানা নেই। আমি অনুমান করলাম, একটা হাজার ভোল্টেজ বিদ্যুৎ আমার সারা দেহকে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, যাবো, এখনই।

আমি জানি তুমি আমার বোনকে ভালোবাসো। এখন তাকে দেখে ঘৃণা করবে না তো?

না, তা হতেই পারে না।

কথা দাও, তুমি এখানে থাকবে যে কয়দিন থাকতে চাও।

রডিগোর দিকে তাকালাম। সে অনুমতি দিল।
বললাম, কথা দিলাম।
নমিতা, যে রুমটায় থাকতো সেখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করবো।
তাদের বাড়ি থেকে হেলথ সেন্টারের দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার। রডিগোকে সঙ্গে নিয়ে বের হলাম ট্রাইসাইকেলে চড়ে।
সকাল এগারোটায় নমিতার রুমে গিয়ে হাজির হলাম। চমকে উঠলাম তার শরীরের অবস্থা দেখে। মনের ভেতর সযত্নে রাখা নমিতার ছবিটার সঙ্গে বাস্তবের নমিতাকে মেলাতে চেষ্টা করলাম। মিলছে না। অনিন্দ্য সুন্দরী, সদাহাস্যময়ী নমিতার এ যেন প্রেতাত্মা। চোখে চোখ পড়লো। চুপচাপ দাড়ালাম পাশে গিয়ে। সে দেখলো আমাকে। ঘাড় বাকিয়ে আবারও দেখলো, কি যেন খুজছে দ্রুত। স্মৃতির পাতাগুলো খুজে ফিরছে নমিতা।
রডিগো তার ভাষায় নমিতাকে বললো, চেনো একে?
নমিতা ভালো করে দেখলো আমাকে। চোখে-মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করলো। হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত পিঠ ধরে সোজা করে বসতে সাহায্য করলাম।
মুখে হাসি টেনে এনে বললো, তুমি ইমন। আমি কি সঠিক বলেছি?
হ্যা।
আবেগে, আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেললো। তার মাথায় হাত রাখলাম। একেবারে পাশ ঘেষে বসলাম।
ইমন, তুমি এসেছো এতোদিন পর! ঈশ্বরকে লাখো ধন্যবাদ। মহান ঈশ্বর আমার প্রার্থনা কবুল করেছে। ইমন, আমি যে অসুস্থ। ইমন, আমি খুব সুন্দর ছিলাম, আমি, আমি...।
সে হাপাতে লাগলো। রডিগো বেরিয়ে গেল রুম থেকে। আমি তাকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।
ইমন, তুমি জানো আমার কি হয়েছে?
জানি।
জানো? আমকে ঘৃণা করো না তো?
না। আমি তোমাকে ভালোবাসি।
ঈশ্বর মহান। তুমি কতো ভালো। ইমন, তুমি আমাকে ঘৃণা করো না তো?
না, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।
কিন্তু... আমি তো... তোমাকে দেয়ার কিছু নেই। ইমন, তুমি এসেছো, আমার অবাক লাগছে। কেন আরো অনেক আগে এলে না? আমি তো এখন...।
তোমার কিচ্ছু হয়নি।জগতের কতো মানুষের কতো শত রোগ হয়। তুমি ভালো হয়ে যাবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবে।
বালিশের নিচ থেকে পুরনো এলবামটাকে বের করলো। ইমন, দেখো, আমি কতো সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছিলাম। আর এখন...। এই দেখো, তোমার প্রতিটি ছবি আমি কতো যত্ন করে রেখেছি। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তোমাকে দেখি। ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, শুধু একবার, একটিবার যেন তোমার দেখা পাই। পেয়েছি। এখন আমার মরতেও দুঃখ নেই। বালিশের নিচে থেকে পার্সটা বের করে আমার হাতে দিল।
ইমন, তোমার এক হাজার ডলার। তোমাকে কতোবার দিতে চেয়েছি, তুমি নিতে চাওনি। আজ আমি দায়মুক্ত হতে চাই।

তুমি আমাকে ভালোবাসো?

হ্যা।

তাহলে ডলারগুলো রাখো। এগুলো তোমার জন্য।

না, আমার প্রয়োজন নেই। আর কয়দিনই বা বাচবো। সরকার আমাকে খাওয়াচ্ছে, চিকিৎসার চেষ্টা করছে। ডলারের তো প্রয়োজন নেই।

তবু রাখো, ওটা ঋণমুক্তি।

কি বললে? কিসের ঋণ? আমিই তো তোমার কাছে ঋণী।

না, হওনি। নমিতা, তোমার মনে পড়ে সেই ১৯৭৪-এর কথা? বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য পাঠিয়ে সেদিনের আট কোটি মানুষকে ঋণী করেছো। বাংলাদেশের মানুষ জানে না। কিন্তু আমি তো জানি। আমি তোমার সেই মহান দানের প্রতিদান দেয়ার স্পর্ধা করি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমার পাশে এসে ক্ষণিকের জন্য হলেও দাড়াতে পেরেছি।

নমিতা খুশি হলো। বললো, ঈশ্বর কতো মহান।

বিকেলে ডাক্তার এলো রুটিন ভিজিটে। নমিতাকে দেখে অবাক হলো। রোগী মানসিকভাবে সুস্থ। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো।

ডাক্তার বললেন, গত তিন বছর ধরে সে এখানে আছে, আজ তাকে প্রথম দেখলাম হাসিখুশি। একজন রোগীর জন্য এটা ভালো লক্ষণ, আপনি কিছুদিন থাকুন, দেখবেন নমিতা শারীরিক সক্ষমতা কিছুটা ফিরে পাবে।

জানতে চাইলেন বাংলাদেশে এইডস রোগী আছে কি না এবং এ ধরনের হেলথ সেন্টার সুবিধা রয়েছে কি না।

বললাম, থাকতে পারে। আমার জানা নেই। এ বিষয়ে আপনার কোনো কমেন্ট?

হ্যা, এইডস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যেসব কারণে এইডস হয় তা পরিহার করতে হবে। তারপরও হতে পারে, হয়ে যায়। আমি বলবো, এইডস রোগীদের প্রতি সদয় হোন। তাদেরকে ঘৃণা করবেন না। এবং সমাজ পরিত্যক্ত না করে একটা নির্দিষ্ট স্থানে তারা যে কয়দিন বাচবে। থাকতে দিন। যাই হোক, তারা তো মানুষ।

ডাক্তার চলে গেলেন। নমিতার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী এনেছিলাম। তা বের করে দিলাম। খুব খুশি হলো।

ইমন, আমি তো এখন... এসব পরতে পারবো না। আমি যে হাটতে পারি না, বাইরে যেতে পারি না, আমি যে...। কেদে উঠলো নমিতা।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। পরিবেশকে হালকা করতে বললাম, কি খাবে নমিতা? তুমি তো চিঠিতে লিখতে ম্যাকডোনাল্ডস-এর কথা। এনে দেবো?

সম্মতি দিল।

ইমন, তুমি কতোদিন থাকবে?

সাত দিন।

ও... কি মজা। সামনেই তো ভ্যালেন্টাইনস ডে। ওই দিনে এখানে সারা দিন উৎসব হয়। তোমার দেয়া কাপড়গুলো ওই দিন পরবো, সাজবো, তারপর...। ইমন, আমি তো কোথাও যেতে পারবো না। তুমি এলে, ভালোবাসার এই দিনে, অথচ...।

শীত বিকেলের সূর্যটা তখন ধূসর রঙ ছড়াচ্ছে। নমিতা বললো, ইমন, আমি ওই হুইলচেয়ারে বসি, তুমি আমাকে বারান্দায় নিয়ে যাও। ওখানেই বসবো। ওই বিশাল নীল আকাশটা দেখবো। মুক্ত আকাশে পাখিদের উড়তে দেখবো। কতোদিন দেখি না এসব।

হুইলচেয়ার ঠেলে বারান্দায় এলাম। হালকা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সামনের দিকটা খোলামেলা। দূরে কর্ন খামার। পাখিদের কিচির–মিচির শব্দ। তারা ফিরে যাবে আপন নীড়ে।

ইমন, কেমন লাগছে আমার দেশ?

চমৎকার। আমাদের দেশের কিছু এলাকার সঙ্গে অপূর্ব মিল রয়েছে।

ইমন, তোমার চিঠির জবাব দিইনি কেন জানো?

আমি তোমার জবাবের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

তুমি আসবে, আমাকে জানাতে পারতে।

জানাইনি ইচ্ছে করে। ভেবেছিলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো।

পেয়েছো সারপ্রাইজ?

হ্যা, যা কল্পনাও করিনি। ঈশ্বর এতো কঠিন।

না, না–না, ঈশ্বর মহান, আমি পাপের প্রায়চিত্ত করছি। থেমে গেল কিছুক্ষণ।

আমি তার পাশ ঘেষে বসলাম।

ইমন, আমি যখন মিনদানাউ–এ চাকরি করি তখন পরিচয় হয়েছিল এক যুবকের সঙ্গে। নাম হ্যারিস। মুসলিম। স্মার্ট, হ্যান্ডসাম ও অমায়িক। সে কি করতো জানতাম না। পরিচয় গভীর হলো। আমরা একত্রে থাকতে শুরু করলাম। তাকে বিয়ে করতে চাইলাম। সে কিছুটা রাজি হলো। মাঝে মধ্যে বিনা নোটিশে সে উধাও হয়ে যেতো। আবার তিন চার দিন পর ফিরে আসতো। তেমনি একদিন উধাও হলে, আর এলো না। আমি তখন প্রেগনান্ট। তিন দিন পর স্থানীয় পত্রিকায় তার ছবি দেখে চিৎকার করে উঠলাম। দেহ ক্ষতবিক্ষত বুলেটের আঘাতে। জানলাম, সে ছিল মরো। *ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট*–এর একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা। আর্মিদের সঙ্গে যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে। যে ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম তা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। চাকরিটা ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। সবাইকে জানালাম আমার প্রেগনানসির কথা। কেউ বললো, বাচ্চা ফেলে দাও। আমি তা করিনি।

সমাজের মানুষেরা কিছু বলেনি?

ফিলিপিন্স মাতৃতান্ত্রিক দেশ। মায়ের পরিচয়েই সন্তান বড় হয়।

সে সন্তান এখন কোথায়?

দুর্ভাগ্য। তার জন্মের সাত মাস পর মারা গেল। আমি তখন দিশেহারা। ওই দুর্দিনেই তোমার কাছে ডলার চেয়েছিলাম কোনো উপায় না দেখে। ঈশ্বর মহান, তুমি পাঠিয়েছো।

মিলদানাউয়ের সেই মুসলিম গেরিলাকে তুমি কি ঘৃণা করো?

না। সে লড়েছে তার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য। মা ও মাটি প্রতিটি সৎ মানুষের কাছে অতি প্রিয়। তার দৃষ্টিকোণ থেকে সে সঠিক। আমি তাকে সম্মান করি। ইমন, তুমি নিশ্চয় জানতে চাইছো এইডস কোথা থেকে এলো আমার দেহে, তাই না?

চুপ করে থাকলাম।

কিছুক্ষণ থামলো সে।

হংকং যাবার পর সেখানে এক ইনডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয়। যখনই দেখা হয় তখন সে ভালোবাসার কথা বলে, জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখায়। এক সময় তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। জানতাম না সে ক্ষমাহীন প্রতারক। আমার দেহে এইচআইভি ঢুকিয়েছে ওই শয়তানটাই। জীবনের বাকি স্বপ্নটাও হারিয়ে ফেললাম। চাকরি হারালাম। দেশে ফিরে এলাম। দিনে দিনে শরীর দুর্বল হতে থাকলো। অবশেষে এই হেলথ সেন্টারে আশ্রয় নিলাম। তোমাকে ইচ্ছে করেই জানাইনি এসব। ইমন, তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো?

না। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে ঘৃণা করতে নেই। তুমি শুধু আমার নও, প্রতিটি বাংলাদেশির প্রকৃত বন্ধু। বাংলাদেশের দুঃসময়ের স্বেচ্ছায় সাড়া দিয়েছিলে। তুমি ক্ষুদ্র। কিন্তু মহান। আজ বলতে দ্বিধা নেই, তুমিই প্রথম আমাকে শিখিয়েছিলে দেশপ্রেম।

ঈশ্বর মহান এবং তুমি এতো ভালো কেন? ইমন, কেন তুমি আগে এলে না, কেন আমাকে নিয়ে গেলে না, তুমি নিয়ে গেলে হয়তো...।

রাত নেমে এলো। হালকা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে খণ্ডিত চাদটা দেখা দিল। বললাম, চাদটা খুব সুন্দর তাই না?

ঠিক আমারই মতো। ইমন, দেখো চাদটার অর্ধেক ঢাকা অর্থাৎ কালো। ইমন, মাঝে মধ্যে পূর্ণিমা রাতের চাদটাকে দেখতাম আর ভাবতাম, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে তুমি হয়তো আমারই মতো একই চাদকে দেখছো। ওই চাদ থাকবে, আকাশটা তেমনি হয়তো রঙ ছড়াবে, তুমি থাকবে, শুধু থাকবো আমি? ওই চাদটা সাক্ষী এবং ঈশ্বর সাক্ষী। ইমন বলো, তুমি আমাকে ঘৃণা করো না তো?

না। আমি তোমাকে সম্মান করি এবং ভালোবাসি চিরদিনের জন্য।

ইমন, মৃত্যুর পর যদি জীবন ফিরে পাই, ঈশ্বরের কাছে আমি তোমাকেই চাইবো। তুমি?

ঠিক তোমার মতোই। তুমি কৃশ্চিয়ান, আমি মুসলিম। ঈশ্বর মুছে দিক এ সীমারেখা।

তার শুকনো মাংস বিহীন হাত দুটো দিয়ে আমার মাথা বুলিয়ে দিল।

ঠোটের কাছে মুখ এনে চুমু দিতে গিয়ে থেমে গেল।

এয়ারপোর্ট রোড, সিংগাপুর থেকে

শুধু তোমারই জন্য

– মাহবুবা আলম

গতকালই পেলাম তোমার বহু কাঙ্ক্ষিত চিঠিটি। এদিকে প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকতাম তোমার চিঠির আশায়। আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। বাড়িতে বসে বসে এখন শুধু তোমার স্মৃতিচারণ আর প্রতীক্ষা। ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে এলো। জানুয়ারিতে আমার বহু প্রতীক্ষিত তোমাকে পাবো সে আশায় দিন গুনছিলাম।

গত প্রায় এক মাস যাবৎ হঠাৎ করেই তোমার কোনো খোজখবর নেই। চিঠি যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ। মনে নানান আশংকা। তবে কি আমার অনেক পরিচিত বন্ধুদের মতোই পরিণতি অপেক্ষা করছে আমার জন্য? আমাদের মতো প্রেম তো আরো অনেকেরই ছিল। রীতা, মিথুন, জুই, মিজান আরো অনেকের।

মিথুন, মিজান আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে তাদের বরণ করে নেবে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে। তারপর পার হয়ে গিয়েছিল দিন মাস করে কয়েকটি বছর। প্রথম দিকের আবেগের আতিশয্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে এক সময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘ নীরবতার পর এক সময় খবর আসে তারা দুজনেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছে দুই শেতাঙ্গিনীকে। এক সময় তারা দেশেও ফিরে এসেছিল তাদের নতুন জীবনসঙ্গিনীদের নিয়ে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের। মিথুন আর মিজান দুঃখ প্রকাশ করেছিল রীতা ও জুইয়ের জন্য। বাস্তবতার আলোকেই নাকি তাদের নিতে হয়েছিল এ রকম সিদ্ধান্ত। তারপর একদিন ফিরেও যায় আমেরিকায়। তাদের নাকি খাপ খাচ্ছিল না এ দেশীয় পরিবেশের সঙ্গে। অথচ রমনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাদের কেটেছিল কতো না আবেগঘন এবং স্বপ্নময় মুহূর্ত।

আমেরিকা যাবার আগে তারা তো রীতা আর জুইকে দিয়ে গিয়েছিল অনেক সুখের হাতছানি। কিন্তু হায়! কঠোর বাস্তব যখন এগিয়ে এলো তখন নিমেষে মিশিয়ে গেল পুরনো সেই স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি। রীতা ও জুইয়ের চোখের পানিতে এখন হতাশা ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

কাল বিকেলে বাড়ির ছাদের বাগানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম একা একা। চারদিকের পরিবেশ ছিল নীরব ও নিঝুম। নানান চিন্তার আবর্তে মন ভারাক্রান্ত। এক সময় স্মৃতি ফিরে যায় ইউনিভার্সিটির দিনগুলোতে।

কয়েকদিন আগেই তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ইউনিভার্সিটির এক নবীনবরণ অনুষ্ঠানে। নতুন ছাত্রীদের তালিকায় শিল্পী হিসেবে আমার নামও ছিল। সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্টেজ থেকে বেরিয়ে দেখি আমার স্যান্ডাল জোড়া নেই। খোজাখুজি করছিলাম।

এমন সময় ভলান্টিয়ারের ব্যাজ পরে এগিয়ে এলে তুমি। আপনি কি কিছু খুজছেন? প্রশ্ন তোমার। লজ্জা পেলাম আমি।

না, মানে স্যান্ডাল খুজে পাচ্ছি না আমার। এখানেই ছিল। অসহায় ভাবে বলি আমি।

তুমিও কতোক্ষণ খোজাখুজি করলে আমার সঙ্গে। কিন্তু নাহ! কোথাও খুজে পেলে না। শেষে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললে, আপনি একটু বসুন ওই চেয়ারটায়। আপনার স্যান্ডালের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলে ত্বরিত বের হয়ে গেলে তুমি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলে। হাতে কাগজের প্যাকেটে এক জোড়া স্যান্ডাল। বললে, দেখুন তো কোনো রকমে কাজ চালানো যায় কি না।

লজ্জা পেয়ে বলি, আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম। তবে মনে মনে বলি, ইজ্জত বাচিয়েছে আল্লাহ। খালি পায়ে হলে ফিরে গেলে মানসম্মান আর থাকতো না আজকে। আপনাকে তো অনেক কষ্ট দিলাম। এখন বলুন তো স্যান্ডাল জোড়া কোথায় এবং কেমন করে ফেরত দেবো।

জবাবে তুমি বললে, আমার নাম রুবাইয়াত। মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আমি। থাকি ইকবাল হলে। তবে স্যান্ডাল জোড়া এনেছি আমার খালাতো বোন ঝুমুর কাছ থেকে। সে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। রোকেয়া হলের তিনশ ছয় নাম্বার রুমে থাকে। ভালো কথা, আপনি কোন হলে থাকেন? কি পড়ছেন?

আমি এবার ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। রোকেয়া হলের দুইশ সাত নাম্বার রুমে থাকি। আর হ্যা, আমার নাম নিশি। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কি স্যান্ডাল জোড়া ঝুমুআপার রুমে পৌছে দেবো?

তা মন্দ হয় না। বললে তুমি।

এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিই।

তিন চার দিন পরের কথা। ক্লাস শেষে কলা ভবন থেকে বেরিয়ে আসছি। এমন সময় সামনে পড়ে গেলে তুমি। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করি।

তুমি হেসে জবাব দিলে, ভালো। তবে দুঃখিত, প্রথমে আপনাকে খেয়াল করিনি বলে। তা আপনার ক্লাস কি শেষ আজকের মতো?

হ্যা। জবাব দিই আমি।

তারপর টুকটাক কিছু কথাবার্তার পর চলে যাও তুমি।

এভাবেই দিন কাটতে থাকে। মাঝে মধ্যে দেখা হয় দুজনার। সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তা হয় দুজনের। এ পর্যন্তই। এদিন উত্তরায় গিয়েছি বড় খালার বাসায়। বিকেলে হলে ফিরে আসার জন্য অনেক্ষণ যাবৎ দাড়িয়ে আছি বাসস্ট্যান্ডে। কিন্তু বাস বা স্কুটার কোনো কিছুরই দেখা নেই।

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ করে একটি স্কুটার আমার সামনে এসে থেমে যায়।

তাকিয়ে দেখি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছো তুমি। হেসে বললে, এখানে একা একা দাড়িয়ে যে?

জবাবে বলি, বড়খালার বাসায় এসেছিলাম। অনেকক্ষণ যাবৎ দাড়িয়ে আছি। কিন্তু কোনো বাস বা স্কুটার আসছে না।

তুমি বললে, বাস ধর্মঘট থাকায় আজ বাস আসবে না। স্কুটারেও প্রচণ্ড ভিড়। কখন পাওয়া যাবে বলা যায় না। তারচেয়ে এক কাজ করুন, আমার সঙ্গেই উঠে আসুন। আমিও হলেই যাবো। এতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

না না, আপত্তি থাকবে কেন? বরং ভালোই হলো, পরিচিত কাউকে পাওয়ায়।

স্কুটারে উঠে মনে মনে ভাবি, বাচা গেল স্কুটার পাওয়ায়। না হলে কতোক্ষণ যে, একা একা দাড়িয়ে থাকতে হতো কে জানে?

আমাকে চুপ থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার, চুপ করে আছেন যে? কিছু ভাবছেন নাকি?

না, তেমন কিছু না। আর হ্যা আমাকে আপনি করে বলবেন না। আপনি আমার সিনিয়র। বরং তুমি করে বললেই খুশি হবো।

ও, এই কথা। ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি করেই বলবো।

তারপর নানান আলোচনায় এক সময় পৌছে যাই হলে।

নামার সময় বললে, স্কুটার ভ্রমণটা ভালোই হলো ভালো একজন সঙ্গী পাওয়ায়।

মানে? জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাই আমি।

আরে না, এমন কিছু নয়। হালকা ঠাট্টা করছিলাম। কিছু মনে করলে উইথড্র করছি বলে মিট মিট করে হাসতে লাগলে তুমি।

এ সকল কথার মাঝে বিদায় নেয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলে, বিকেলে সাধারণত কি করো?

জবাবে বললাম, এমন কিছু নয়, সাধারণত বারান্দায় বসে বই পড়ে কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাই।

তুমি প্রস্তাব করলে, কাল বিকেলে চলো না রমনা পার্কে বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘুরে আসি।

তোমার এই আকস্মিক প্রস্তাবে কিছুটা অবাক হয়ে তোমার দিকে তাকালাম।

সঙ্গে সঙ্গে তুমি বললে, অসুবিধা হলে থাক। আমি এমনিতেই বলছিলাম।

দেখা যাক, বলে বিদায় নিই সেদিনের মতো।

পরদিন বিকেলে কি এক আকর্ষণে যেন বেরিয়ে আসি হল থেকে।

সেই শুরু।

তারপর অনেক দিন, মাস চলে যায়। আমাদের মাঝে ভাবের লেন-দেন আর মন দেয়া-নেয়ার পর্ব পাকাপাকি হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে তোমার বিদেশ যাওয়ার আগে পারিবারিকভাবেই পাকাপাকি হয়ে যায় আমাদের বিয়ের কথাবার্তা।

এক সময় বিদেশে চলে যাও তুমি। কিন্তু পেছনে রেখে যাও অনেক স্মৃতি। বিদেশে থাকা অবস্থায় চিঠিপত্রের মাধ্যমেই আমাদের দুজনের যোগাযোগ চলতে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ করে গত এক মাস যাবৎ তোমার কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম না। ফলে মনে দেখা দেয় নানান সন্দেহ। তবে কি রীতা আর জুইয়ের পরিণতিই অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

এমনি সব চিন্তার মাঝেই হঠাৎ করে গতকাল পেয়ে যাই তোমার চিঠি। আর চিঠির মাধ্যমেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় কেন তুমি গত এক মাস চিঠিপত্র লিখতে পারোনি। আসলে পড়াশোনার চূড়ান্ত পর্যায়ে নানান আনুষ্ঠানিকতা এবং রিপোর্ট তৈরির কাজ করে তোমার পক্ষে যে সম্ভব হয়নি চিঠি লেখা তা বুঝে উঠতে

পারিনি। তাই দেখা দিয়েছিল নানান সন্দেহ। কিন্তু তোমার আবেগঘন চিঠি আমার সব সন্দেহকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার দিয়েছে।

চিঠির শেষে তুমি লিখেছো, আমার আর বিলম্ব সইছে না। দিন কে মাস মনে হচ্ছে এখন। ভাবছি কখন এসে তোমাকে একান্ত করে পাবো নিজের মাঝে। তুমিও কি তাই ভাবছো?

গত দুই দিন বার বার পড়েছি তোমার চিঠি। এবার আমার প্রতীক্ষার পালা শেষ হয়ে এলো। এখন থেকে তুমি শুধুই আমার। এবং আমি অপেক্ষা করবো শুধু তোমারই জন্য।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

দুটি প্রশ্ন

– প্রভা

আমরা ছোটবেলা থেকেই নানাবাড়ি থেকেছি। আমার খালার বাড়ি ছিল নানাবাড়ি থেকে একটু দূরে। তাই তারা সব সময় নানাবাড়ি আসতেন।

আমার খালাতো ভাই শামীম। আমি তাকে শামীমভাই বলেই ডাকতাম। সে আমাকে তুই তুই করে কথা বলতো। কিন্তু যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম তখন লক্ষ্য করলাম সে আমাকে তুমি সম্বোধন করছে। এ নিয়ে তার সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যেই লাগতো। ধীরে ধীরে তার কথা-বার্তা, আচার-আচরণ সব কিছু আমার কাছে অন্য রকম লাগলো। তবে তাকে আমি বুঝতে দিতাম না। তার সঙ্গে আগের মতোই ব্যবহার করতাম।

আমার পড়ার টেবিল ছিল নানির ঘরে। নানা জীবিত ছিলেন না বলে নানির কাছেই থাকতাম। অনেক রাত ধরে পড়তাম। সে প্রায় প্রতিদিনই নানাবাড়ি আসতো। প্রায়ই রাতে দশটা সাড়ে দশটার দিকে এসে নানির সঙ্গে গল্প শুরু করে দিতো। গল্প করতে করতে এক সময় বলতো, নানি আমি কাল রাতে একটা স্বপ্নে দেখলাম, প্রভা-র বিয়ে হচ্ছে খুব কালো একটা ছেলের সঙ্গে।

আমি বুঝতে পারতাম আমাকে রাগানোর জন্য বলা হচ্ছে। তবু তার সঙ্গে কৃত্রিম ঝগড়া করতাম। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। সে যে আমার প্রতি দুর্বল সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি একটা বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে দেখি সে বসে আছে। আমরা সবাই গল্প করছি। কিন্তু শামীমভাইকে আশপাশে কোথাও দেখছি না। আমিও ততোদিনে তার প্রতি একটু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে ছিলাম খুবই সচেতন। তাই আজ পর্যন্ত কোনো ঝামেলায় নিজেকে জড়াইনি। তাকে না দেখতে পেয়ে সবার মাঝ থেকে উঠে আসি সে কোথায় আছে দেখার জন্য। এসে দেখি সে আমার মামির ঘরে বসে একটা পত্রিকা পড়ছে।

আমাকে দেখেই বললো, প্রভা শোনো, এদিকে বসো।

আমি কিছু না ভেবে তার পাশে বসে পড়ি।

এ কথা সে কথা বলার পর সে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শোনার পর মনে হলো আমি ভুল শুনছি।

তাই তাকে বললাম, কি বললেন?

সে একই কথা আবারও বললো।

তখনই উঠে দাড়িয়ে বললাম, কি যে বলেন।

বলেই ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছি অমনি সে আমার হাত ধরে বলে, তুমি এতো বোকা কেন? তুমি কি কিছু বোঝো না।

বললাম, ছেড়ে দিন, না হলে আম্মাকে ডাক দেবো।

সে হাত ছেড়ে দিলে আমি অন্য ঘরে গিয়ে কেবল দাড়িয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। এই প্রথম কোনো পুরুষমানুষের স্পর্শ পেলাম। নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়। তার বুকে মুখ লুকাতে ইচ্ছা করে। নিজের ইচ্ছাগুলোকে প্রশ্রয় না দিয়ে সেদিন কিভাবে যে ছুটে বেরিয়ে গেলাম তা শুধু আমিই জানি।

তারপর থেকে তার সঙ্গে আমার আর বেশি কথা হয়নি। এ ঘটনার প্রায় এক বছর পর শুনলাম তার সঙ্গে নাকি পাশের বাড়ির ভাবীর সম্পর্ক ছিল। এ কারণে ভাবী স্বামীর সংসার ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এসব শোনার পর তার প্রতি মনটা আরো বিষিয়ে ওঠে।

স্কুলে বান্ধবীরা সবাই বলতো, তোর শামীমভাইয়ের ঘটনাটা কি সত্যি?

এটা যে সত্যি না সে কথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। পরে মনে হয়েছে, হয়তো তাদের কথাই ঠিক। *যা রটে, সব না হলেও কিছু তো বটে।*

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এখন সে একটা ভালো চাকরি করে। আর আমি এবার অনার্স ফাইনাল দেবো। তার সঙ্গে খুব কম দেখা হয়। দেখা হলেও মনে হয় আমরা কেউ কাউকে চিনি না।

দুটি প্রশ্ন আজও আমার মনে বাজে।

সে কি সত্যিই আমায় ভালোবেসেছিল?

ভাবীকে নিয়ে ঘটনার সত্যতা কতোটুকু ছিল?

উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ থেকে

অপ্রত্যাশিত

– রুস্তম

যার কারণে আমার এ লেখা তার আসল নাম বলতে সমস্যা আছে। আমার দেয়া নামে তাকে আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। তার নাম নদী। সে সম্পর্কে আমার এক ধরনের ফুপাতো বোন। খুব কাছের নয় আবার খুব যে দূরের তাও না।

অনেক দিন পর নদীর এক মামার বিয়েতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। অনেক রাত পর্যন্ত নদী, আমি এবং তার এক খালাসহ গল্প করি। পরের দিন সকলে এক সঙ্গে রওনা দিই গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে। অনেকটা পথ পায়ে হেটে তারপর রিকশা করে যেতে হবে। সকলে এক সঙ্গে হাটছি। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করি, আমরা দুজন সবার থেকে অনেক সামনে চলে এসেছি। অনেক কথার ফাকে তার কাছে জানতে চাই, সে কাউকে ভালোবাসে কি না।

জবাবে সে বললো, আমার মতো কালো, পেতনি মার্কা চেহারার মেয়েকে আবার কেউ ভালোবাসবে!

তার জবাবে পুলক অনুভব করি। সেই প্রথম তার কাছে আমার দুর্বলতা প্রকাশ করি।

সেও রাজি হয়ে যায়।

এরপর তার সঙ্গে আমার প্রথম কথা হয় তাদের বাড়িতে। নদীর মা-বাবা দুজনে সরকারি টেলিফোন অপারেটর। বাসায় সে আর তার ছোট বোন ছাড়া কেউ নেই দেখে তাকে সময় ও ঠিকানা বলে দেখা করতে বলি।

সে নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসে। তিনটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলি। প্রথম দিনের প্রেমালাপ শেষ করে চলে আসি বগুড়া।

এর প্রায় এক সপ্তাহ পর আমাদের আবার দেখা হয়। তাকে নিয়ে যাই কলেজপাড়ার এক বন্ধুর মেসে। বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় পর্বের পর আমাদের কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে বন্ধুটি বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে যায়। এই প্রথম আমরা দুজনে হাতে হাত রেখে কথা বলছি। এক পর্যায়ে তাকে জড়িয়ে তার ঠোটে আমার ঠোট স্পর্শ করি। এতে সে কপট রাগ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে সরে যেতে চায়। তাকে আরো প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরি এবং অনেকক্ষণ ধরে চলে আমাদের একে অপরের ঠোট লেহন। সংবিৎ ফিরে পাই বন্ধুর ডাকে।

সেদিনের মতো প্রেমলীলা সাঙ্গ করে চলে আসি বগুড়ায়।

আমি পড়াশোনা করতাম গাইবান্ধা সরকারি কলেজে। ব্যবস্থাপনা বিভাগে থার্ড ইয়ারে। আর নদী সবে এসএসসি পাস করে তিন–এর উপরে জিপিএ নিয়ে। থার্ড ইয়ারে দুটো অংক সাবজেক্ট থাকায় বগুড়ায় প্রাইভেট পরতে গিয়েছিলাম।

যাহোক, বগুড়া এসে আর মন টিকতে চায় না। বার বার নদীর কাছে যেতে ইচ্ছা করে। তিন চার দিন পর পর চলে যাই নদীর বুকে। আলতো ছোয়াছুয়ি ও চুমু খাওয়া–খাওয়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি। এভাবে চলে প্রায় মাসাধিককাল। অবশ্য সে এর মধ্যে বগুড়া ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে আমার রুমে এসেছিল। সেদিন দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে থেকেছি প্রায় ঘণ্টা খানেক।

কিছুদিন পর বগুড়ার পাট চুকিয়ে চলে আসি গাইবান্ধা। এখানে নিজের রুম, সব চেনা পরিবেশে আমার প্রেম চলে দুর্বার গতিতে। সপ্তাহে তিন দিন আমরা মিলিত হতাম। দৈহিক সম্পর্কের চূড়ান্ত পর্যায় বলতে যা বোঝায় সেভাবে কখনো মিলিত হয়নি। তবে তার বুক থাকতো খোলা। সালোয়ারের ওপর দিয়ে আমাদের কাজ সারতে হতো। দুধের স্বাধ গোলে মেটানোর মতো অবস্থা। এরপরও আমরা দুজন সুখী ছিলাম।

এই অপূর্ণতাটুকু আমাদের মধ্যে দেয়াল সৃষ্টি করতে পারেনি। এভাবে আমাদের প্রেম চলে দীর্ঘ এগারো মাস। তারপর নদীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে।

কি এমন হয়েছিল যে এগারো মাসের সম্পর্ক একদিনেই শেষ হয়ে গেল?

সকালে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় শহরের ভেতর কোনো এক মার্কেটের সামনে। তাকে আমার রুমে আসতে বললে সে আলাদা রিকশা করে আমার রুমে চলে আসে। আমরা কখনো শহরে এক রিকশায় উঠতাম না।

রুমে আসার পর তাকে বলি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে যা বলতে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। তোমার যদি এখন সময় না থাকে তাহলে বিকেলের দিকে দুই ঘণ্টার সময় করে এসো।

তখনকার মতো সে চলে যায় এবং ঠিক বিকাল চারটার সময় আমার রুমে আবার আসে। এসেই বলতে লাগলো, আজকের পর আমি আর তোমার এখানে আসবো না। তুমি কখনো আমার শরীরে হাত দেবে না।

ভাবলাম, হয়তো বাসায় কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তাই মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তাকে শান্ত করার জন্য জড়িয়ে ধরি। সে ছিটকে নিজেকে আমার বাহু থেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং বলে, খবরদার, আমার শরীরে তুমি হাত দেবে না।

ভাবলাম, হয়তো শরীর খারাপ করেছে। সে জন্য আবার তার কাছে জানতে চাইলাম, শরীর খারাপ নাকি?

উত্তর আসে না বোধক।

শরীর ভালো আছে, বাড়িতেও কিছু হয়নি। তাহলে হঠাৎ আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহারের কারণ আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। আমিও একটু জেদি হয়ে উঠলাম। বললাম, কোনো কারণ ছাড়া আমার কাছে যদি না আসো তাহলে আজ তোমার সঙ্গে আমার চূড়ান্ত মিলন হবে।

সে বললো, চেষ্টা করে দেখতে পারো।

তাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিই। এক এক করে তার বাধাকে উপেক্ষা করে বস্ত্র হরণ করছি। বুকে, নাভিতে, বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে চুমুর পর চুমোয় তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করি।

এমন সময় সে আমার ঠোঁট কামড়ে বিছানায় থেকে উঠে গেল।

আমি প্রচণ্ড আঘাত পাই। এরপর আমি যেন আর মানুষ রইলাম না। হয়ে গেলাম একজন পশু। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় আবার ফেলে দিই। সব আবরণ মুক্ত করার পর যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তার ভেতর প্রবেশ করবো ঠিক এই সময় সে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে।

তার কান্না দেখে আমিও যেন নিজেকে ফিরে পাই। তাকে ছেড়ে দিই এবং নিজেই তার সব কাপড় পরিয়ে দিই।

অনেকক্ষণ দুজনে নীরব ছিলাম। নদী আমার কাছে পানি খেতে চাইলো। পানি আনার জন্য বাইরে যাই।

এমন সময় তার দুজন বান্ধবী আসে তাকে নেয়ার জন্য। তাদের দেখতে পেয়ে সে যেন অন্য রকম হয়ে যায়। তাদের সামনে আমাকে, নারী দেহ ভোগী, লুচ্চা, আরো নানান রকম ভাষায় গালিগালাজ করে চলে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যাই।

এখানেই আমার লেখা শেষ হতে পারতো। এরপর তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার অনেক বান্ধবীদের সামনে আমাকে অপমান করে।

তারপরও হাল ছাড়ি না। আবারও তার সঙ্গে দেখা করতে যাই।

সে আমাকে শাসিয়ে দেয়।

দুই তিন দিন পর নদীকে দেখার জন্য পাড়ায় যাই। তাদের পাড়ার ছেলেরা তার সামনে থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যায় একটা পরিত্যক্ত টেলিফোন অফিসে। তাদের পাড়ার মেয়েকে উত্যক্ত করার অপরাধে বেশ পেটায়। তারপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় নদীর বাবা-মায়ের কাছে। তারাও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

আমাকে আবার যখন মারধর করা হয় তখন আমার ভালোবাসার নদী আমার সামনে দাড়িয়ে। একটিবারের জন্য সে কাউকে বাধা দেয়নি। ভেবেছি সে হয়তো বাড়িতে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে জানাতে চায় না। রাত দশটার দিকে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এতো অপমান এবং মার খাওয়ার পরও একটি দিনের জন্যও নদীকে ভুলতে পারিনি। আবারও নদীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তার সঙ্গে একটিবার দেখা করার জন্য তার বান্ধবীদের অনেক অনুরোধ করি। কিন্তু তারা কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। নদীর বাসায় টেলিফোনে কল করলে তাদের বাসার কাজের মেয়ে আমাকে *জারজ সন্তান* বলে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। রাস্তায় তার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছি। তবুও তার পাথর হৃদয় গলাতে পারিনি। নদীকে পাওয়ার জন্য যে যেভাবে বলেছে সেভাবেই নত হয়েছি। বিনিময়ে পেয়েছি শুধু অপমান আর অপমান।

সে আমাকে যতোই অপমান করুক না কেন, আমার হৃদয়ে তার আসন আগের মতোই আছে। এখনো আমি তার প্রাইভেট পড়তে যাওয়া-আসার রাস্তায় বসে থাকি। আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন সে রিকশা দাড় করিয়ে বলবে, রিকশায় উঠে এসো, কথা আছে।

হাটলক্ষ্মীপুর, গাইবান্ধা থেকে

না থেকে হ্যা

অনেক আগের কথা। ১৯৮৪ সাল। আমি তখন ক্লাস ফোর–এর ছাত্রী। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে স্কুলের মাঠের গোল পোস্ট ধরে আমরা কয়েক বান্ধবী মিলে খেলছিলাম। তখন পাচ ছয়জন ক্লাস টেন–এ পড়ুয়া ছাত্র এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলো আমরা কেউ একুশে ফেব্রুয়ারির নাটক করবো কি না?

আমরা কেউ রাজি হচ্ছিলাম না।

আমাদের বাড়ি পাশের এক ছেলে বললো আমাকে নেয়ার জন্য।

আমাকে অনেক বোঝানোর পর তাদের বললাম, আমার অভিভাবকের মত ছাড়া এই নাটক করতে পারবো না।

ওই দিন রাতেই তারা আমাদের বাড়ি গিয়ে বললো।

আমার অভিভাবক রাজি হলো।

যার সঙ্গে নাটক করেছিলাম সে আমার বড় বোনের ক্লাসমেট। আর এখান থেকে শুরু আমাদের জীবন কাহিনী।

আমার মনে আছে তখন এরশাদ সরকারের আমল। শুক্র, শনি দুই দিন স্কুল ছুটি থাকতো। আর আমাদের কেজি ও হাই স্কুল একই সঙ্গে শুরু হতো সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত।

যার সঙ্গে নাটক করেছিলাম তার সঙ্গে স্কুলে আসা–যাওয়া সময় দেখা হতো। প্রথম প্রথম লজ্জায় কথা না বললেও পরে কেমন আছি না আছি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর বেশি কথা বলা হতো না। আমরা ক্লাস করতাম স্কুলের পূর্ব দিকে টিন শেডে। আর তারা করতো বিল্ডিংয়ে। টিফিনের সময় প্রতিদিনই আসতো। আমি তার চেয়ে অনেক ছোট হওয়ায় কেউ কিছু মনে করতো না। তবে আমাদের ক্লাসের দুষ্ট ছেলেরা আমাকে অনেক কিছু বলতো।

এভাবে আমাদের মাঝে মেলামেশা শুরু হলো। মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়ি আসতো আমার বোনের কাছে। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি বোনের কাছে নয়, আমার উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ি আসতো। যখন আমাদের বাড়ি আসতো তখন আমার লেখাপড়ায় সাহায্য করতো। আমাদের বাড়ির উঠানের দক্ষিণ পাশে একটি বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ ছিল।

সে বলতো, তাকে যেন প্রতিদিন আমি ফুল দিই।

আমিও যেন কি টানে প্রতিদিন স্কুলের ব্যাগে তার জন্য ফুল নিয়ে যেতাম।

এরই মাঝে আমি বড় হয়ে গেছি। সব কিছু বুঝতেও শিখেছি। যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন তার ভালোবাসার কথা আমাকে বলে। আমাকে এও বলেছে, আমি যেন অনেক ভেবে–চিন্তে উত্তর দিই।

দুই দিন পরে আমি তাকে না করি। এরপর থেকে তাকে কোথাও দেখা যায় না। তার এক বন্ধুর কাছে খবর জানতে চাই সে কোথায়।

বললো, বাড়িতেই আছে।

এর মাঝে তাকে দেখতে না পেলে আমারও ভীষণ খারাপ লাগতো। একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে দেখি তার সারা ঘর ভরা *না* লেখা। তার মুখ ভর্তি খোচা খোচা দাড়ি দেখে আমার জানি কেমন মায়া জন্মে গেল। সেই দিন আমিও বলেছি ভালোবাসি।

সেই থেকে দীর্ঘ আট বছর প্রেম করেছি। আমাদের সাহায্য করতো তার এক খালা। আমার এসএসসি পরীক্ষার পর যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না। অনেক কষ্ট করে আমার ফুপাতো বোনের ছেলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতাম। বোনের ছেলের মাধ্যমে তার বাগানের ফুল পাঠাতো। বাড়িতে নিলে বড় বোন জিজ্ঞাসা করবে এই ফুল কোথা থেকে এলো, সেই ভয়ে রজনীগন্ধা ফুলের ডাল ধান ক্ষেতের মাঝে পুতে রাখতাম। আর প্রতিদিন বিকেলে সেখানে গিয়ে ফুলের গন্ধ নিতাম।

সে সময় যে কতো ভালোলাগতো তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলো। কলেজে ভর্তি হলাম। এর মাঝে বাবা–মা বিয়ের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। আমি যতোই না করি ততোই তারা চাপ প্রয়োগ করেন। আমাকে না জানিয়ে তারা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। যেদিন আমার কলমা হবে সেদিন আমার পাশের বাড়ির এক ছেলের কাছে জানতে পেরে তখনই তার কাছে চলে যাই।

অনেক ঘাত–প্রতিঘাত পেরিয়ে আমাদের দুজনের বিয়ে হয়। বিয়ের দুই মাস পর সে জার্মানি–তে চলে যায়। আমি শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম। শ্বশুরবাড়ির প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি যা কোনোদিন চিন্তাও করিনি। তার সকল আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি যা কোনোদিন ভুলবো না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে এইচএসসি পাস করি। যখন ডিগ্রি পরীক্ষার এক মাস বাকি আছে তখন আমিও জার্মানিতে চলে আসি। সে আমাকে এখনো আগের মতো ভালোবাসে। আগে যেমন প্রকাশ পেতো তা এখন ভেতরে রাখে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জার্মানি থেকে

ধূসরিত স্বপ্ন

– আকাশ

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম। এটি বলতে দ্বিধা করবো না।

আমার ভালোবাসার মধ্যে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না, ছিল না কোনো জটিলতা। নিঃস্বার্থ এই ভালোবাসায় পাওয়া, না পাওয়ার কোনো বেদনা ছিল না। ছিল শুধু দুজন দুজনকে কাছে পাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, মন ভরে ভালোবাসার চাহিদা।

প্রায় এক যুগ আগের কথা। যখন ব্যতিক্রম এক পড়ন্ত বিকেলে সেই মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম। এক পলক দেখামাত্রই অন্য মেয়েদের দিকে আর তাকাইনি। কারণ সে এতোই সুন্দরী ছিল যে, তাকে এড়িয়েই চলতে হবে। মনের ভেতরে কেমন যেন ছোট্ট একটা ধাক্কা খেলাম।

আবার দেখার জন্য ব্যাকুল হলাম। এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্রুত দেখে নিলাম তার রূপের মাধুর্যকে। সেই শ্যামবর্ণের মেয়েটির অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ, টানা টানা ভ্রূ ভেজা ভেজা ঠোঁট দুটো ছিপছিপে গড়নের দেহখানা মনের ভেতরে গেথে গেল।

এই সর্বগুণে গুণান্বিত মেয়ের নাম ছিল *কল্পনা* যার সঙ্গে আমাকে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কারণে একই ছাদের নিচে বসবাস করতে হবে প্রায় এক বছর। আগেই অন্যের দেয়া সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তার প্রতি সবই ভেঙে দিয়ে ধীরে ধীরে ভালোবাসতে চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড ভীতু এবং লাজুক স্বভাবের এই আমি তাকে ভালোবাসতে খুব ভয় পেতাম শুধু না পাওয়ার ভয়ে।

মনের অজান্তেই তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারলাম না। আমি জানতাম, তাকে কখনো পাবো না কিংবা তাকে আমার ভালোবাসার কথাও বলতে পারবো না। নীরব এই ভালোবাসা নিয়ে দিনে মাত্র একটা কিংবা দুটা কথা বলার সুযোগ পেতাম তার সঙ্গে। যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই তার সঙ্গে অল্প অল্প করে ফ্রি হতে থাকলাম। তার শরীরের যে কোনো একটা অঙ্গ স্পর্শ করা আমার ছিল চাদ ছোয়ার মতো।

একদিন লুডু খেলার মাঝে প্রথমবারের মতো তার আঙুল স্পর্শ করেছিলাম।

কল্পনা তার ছল ছল আখিতে মায়াবী দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তবে কিছুই বলেনি।

ওর সঙ্গে যখন কথা বলতাম তখন ঠোঁট, বুক, চোখ, চেহারা অপলক দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতাম। ভাবতাম, বিধাতা একে বুঝি নিজ হাতেই গড়িয়েছেন। কল্পনাকে নিয়ে সারাক্ষণ ভাবতাম, স্বপ্ন দেখতাম। আমার সমস্ত কাজ কর্ম সবই ছিল কল্পনা কেন্দ্রিক।

হঠাৎ কোনো একদিন, আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না সেই ক্ষণ, যেদিন সে বলছিল পৃথিবীর সবচেয়ে মুধরতম শব্দটি যেটা সব মেয়ে খুব সহজে বলতে পারে না। আর আমার দিকটা আরো অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটলো। আমার সমস্ত জল্পনা, স্বপ্ন, আশা। সবই ইতি টেনে দিল সেই কথাটি যেটা পুরো এক বছরে তাকে বলতে পারিনি।

বোবার মতো হয়ে গেলাম, গেলাম জড়বস্তুর মতো হয়ে। কল্পনাকে পাওয়ার আনন্দে আমি ওই দিন সারা রাত কেঁদেছিলাম।

অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়ার মাঝে আলাদা একটা ভালোলাগার অনুভূতি কাজ করে বুঝতে পারলাম। আমি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়লাম। মনে হলো দুর্বল কোনো স্বর্ণলতা শক্ত বৃক্ষকে জড়িয়ে বেচে থাকার চেষ্টা করছে। আমার সমস্ত শক্তি যেন কেউ কেড়ে নিল। কল্পনার কথা ভাবতেই আমার শরীরটা যেন অবশ হয়ে যেতো।

প্রায় এক বছর পরে যখন এসএসসি পাস করলাম তখন আমার পরিবারের সবার অমতে শুধু কল্পনাকে সারাক্ষণ কাছে পাওয়ার জন্য এইচএসসি-তে ভর্তি হলাম ওরই স্কুলের পাশের কলেজে। তখন দেখলাম আরেক অন্য রকম কল্পনাকে যে শুধু সুন্দরী নয়ও মেধাবীও নয়, ভালোবাসায়ও উজ্জ্বল।

ও আমাকে ভালোবাসতো প্রায় পাগলের মতোই।

এরই মধ্যে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হলো যার সুবাদে আবার ওদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা শুরু করার অনুমতি পেলাম।

কল্পনাকে পেয়ে নিজেকে নতুন রূপে সাজাতে লাগলাম। সারাক্ষণই ওর ওই আলতো মুখ, গভীর চোখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

ও যা বলতো আমি তা-ই শুনতাম। নামাজ পড়তে হবে, ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, হাতে নখ লম্বা রাখা যাবে না, চুল লম্বা রাখা যাবে না, ভদ্রভাবে চলতে হবে। অন্য মেয়েদের দিকে তাকানো যাবে না, সিনেমা দেখা যাবে না, আরো।

দুজন সারাক্ষণ গল্প করতাম, অনেক কিছু। মাঝে মাঝে মারামারি করতাম। আমি খেয়াল করতাম আমাকে রেখে ও কখনো আগে ভাগে খেতে যেতো না। আমি যে গ্লাসে পানি খেতাম ও সেই গ্লাসে পানি খেতো। আমার হাতের পায়ের নখ কেটে দিতো, মাথায় তেল দিয়ে দিতো, চুল আচড়িয়ে দিতো। কোনো খাবার খাওয়ার সময় আমাকে আগে না দিয়ে সে কখনোই সেটা খেতো না।

শুধু তার নিষেধে আমি ওর শরীরে কখনো স্পর্শ করিনি। ওর এবং আমার সিদ্ধান্ত ছিল প্রতিদিন মাত্র তিনটা করে কিস একে অপরকে দেবো। আমার কোনো ভুল হলে বলতো, মারবো কিন্তু।

বলতাম, হ্যা মারতে পারো তবে হাত দিয়ে নয়, ঠোট দিয়ে।

এভাবে ভালোবাসাবাসির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল আরো দুবছর। উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে এলাম ঢাকাতে। ঢাকা এসে ওকে খুব মিস করতাম। প্রায়ই মিথ্যে অজুহাতে ঢাকা থেকে সাড়ে তিনশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বাড়ি যেতাম ওকে একটু মন ভরে দেখার জন্য।

তখন ও আমাকে পেয়ে দিশেহারা হয়ে যেতো- আমাকে অনেক আদর করতো।

এভাবে আরো দুই বছর পর সেও অনার্স পড়ার জন্য ঢাকাতে এলো। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ভর্তি হলো। সারা ঢাকাতে আমরা প্রেম করতাম। আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ওর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটু দূরে। তাই দুজন গল্প করার জন্য গাড়িতে বা রিকশায় না গিয়ে হেটেই যেতাম প্রায়ই। ও আমায় রেখে চলে যাওয়ার সময় প্রায়ই গাড়ি মিস করতো আরেকটু বেশি সময় আমার পাশে থাকার জন্য।

একদিন ধানমন্ডি লেকে বসে ব্লেড দিয়ে হাত কেটে রক্ত দিয়ে K লিখছিলাম।

কল্পনা বলছিল, পাশে A অক্ষর না থাকলে বেমানান লাগছে। আমার শত বাধা উপেক্ষা করে সে রক্ত দিয়ে A লিখছিল যে কোনোদিন শরীরে ইনজেকশন দিতো না সুচ ফুটানোর ভয়ে।

আমি অবাক হলাম। আসলে ওকে যতোই দেখতাম ততোই অবাক হতাম।

হঠাৎ সে একদিন সকালে আমার হলে চলে এলো। আমাকে দ্রুত পোশাক পরে বের হতে বললো।

কল্পনা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো প্রশ্নে সে বলেছিলো, *জাহান্নামে*।

আরো তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিয়ে সে আমাকে সোজা শ্যামলী কাজি অফিসে নিয়ে গেল।

কিছু বোঝার আগেই বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হলাম ওর সঙ্গে।

পরে ও বললো, ও নাকি স্বপ্ন দেখেছে ওর বিয়ে হচ্ছে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে, তাই ওই কাণ্ড। সে যুক্তি দেখালো, আমরা বিয়ে করেছি সেটা উভয় পরিবার কখনো জানবে না। শুধু যখনই ওর পারিবারিকভাবে বিয়ের চাপ আসবে তখন সে এই কাবিননামা দেখাবে।

রেজিস্ট্রি করা কাবিন এক কপি আমার কাছে এবং অন্য কপি ওর কাছে থাকলো।

দুজন চলে গেলাম পুরো অন্য জগতে। সবার অজান্তে ঢাকাতে ছোট্ট একটা বাসা নিয়ে নির্দ্বিধায় দুজন একত্রে থাকতে লাগলাম। উপভোগ করলাম দাম্পত্য জীবনের সকল আনন্দ। দুজন এক সঙ্গে গোসল করতাম বাথরুমে। ও আমাকে প্রতি বেলা মুখে তুলে ভাত খাওয়াতো, একটা চকলেট ও ওর মুখ দিয়ে আমার মুখে দিতো আর সারাক্ষণ আদর করতো। প্রতিদিন ওর জন্য ফুল কিনে নিয়ে আসতাম। দুজন লুডু, তাশ, দাবা, ক্যারম খেলতাম।

চলে গেল এভাবে বিয়ের এক বছর। ততোক্ষণে আমার মাস্টার্স–এর রেজাল্ট বের হলো।

কিন্তু লুকিয়ে আর কতো দিন? সবাই জেনে গেল।

আগের প্রস্তুতি অনুযায়ী সবই ঠিক ছিল। মেনে নিল আমাদের বিয়েকে। কারণ আমরা দুজনই ছিলাম প্রত্যেকের বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

কিন্তু মেনে নেয়নি একমাত্র কল্পনা নিজেই!

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। চোখ দিয়ে শুধু অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকলো।

আমি একবারের জন্য তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম।

সে রাজি হয়নি। আমাদের বিয়ের কাবিননামা আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও কিছুই করিনি।

সে বলেছিল, সে নাকি তার রুচি পরিবর্তন করতে চায়।

জীবন থেকে ঝরে গেলো দশটি বছর। আর আজ দুই বছর হলো কল্পনা নেই। আমি আজও তার জন্য বসে আছি। আজ সে অন্যের ঘরণী।

ঢাকা থেকে

হৃদয়ে তুমি

– সুমনা

তুহিন,

আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিও। কেমন আছো তুমি? নিশ্চয় ভালো। ভালো থাকার জন্যই তো আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছো।

তোমার এবং আমার সম্পর্কের কোনো বিশেষ নাম নেই। যদিও নামহীন তবুও আন্তরিকতাপূর্ণ। তোমার হাতের লেখা যেমন সুন্দর তেমন হৃদয়কে আকর্ষণ করার ভাষা। তোমাকে কখনো ভালোবাসতে চাইনি। তবুও মনের অজান্তে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। সে ভুলের মাশুল আমাকে প্রতি মুহূর্তে দিতে হচ্ছে।

একদিন তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম আমার কল্পনা, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মিথ্যা। তোমার হৃদয়ে আমার কোনো স্থান নেই। এটাই যদি সত্য হয় তাহলে কেন আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে? কেন তুমি আমার হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিলে? কোন অপরাধে এতো বড় শাস্তি তুমি আমায় দিলে। আজ শুধু মনে হয়, আমি একটা জীবন্ত লাশ। তাহলে কি এটাই আমার প্রাপ্তি?

আমার কাছে ভালোবাসার চেয়ে বিশ্বাসের দাম অনেক বেশি। প্রায় দুই বছর হতে চললো তোমাকে চোখে দেখিনি। তবুও অন্ধের মতো বিশ্বাস করতাম। আমার সেই বিশ্বাসের দাম তুমি দিতে পারোনি। ভালোবাসা সবার একটা ব্যক্তিগত অধিকার। তবে কখনো তোমার ঘরের ঘরণী হতে চাইনি এবং চাইও না। শুধু তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আমার বাসার ঠিকানা দিতে পারিনি বলে।

তোমাকে মিথ্যে বলিনি এবং প্রতারণাও করিনি। সে কারণে আমাকে এতো কষ্ট পেতে হচ্ছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাকে করেছিলাম। অথচ আমার একটা প্রশ্নেরও উত্তর তুমি দাওনি। এমনকি তুমি কি করো, কোথায় থাকো এটা জানার অধিকারও আমার নেই। আমার মনে হয় বাংলাদেশের চোদ্দ কোটি জনসংখ্যাতে যদি প্রথম শ্রেণীর চোদ্দজন নিষ্ঠুর ছেলে খুজে পাওয়া যায় তার মধ্যে তুমি হবে একজন। খুব নামাজ পড়ো, হাদিস মেনে চলতে চেষ্টা করো। অথচ মানবিকতা ও সামাজিকতাকে উপেক্ষা করো। আমাদের ইসলামেও আছে *মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান।*

এমনো হয়েছে মাসে তিন চারটি চিঠি তুমি এবং আমি লিখেছি। অথচ আজ এতো দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যে, মাসে একটা চিঠি পাবো এটাও আশা করা বৃথা। এ দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য কে দায়ী? আমি না তুমি? আমাকে তুমি আজও চিনতে পারোনি। সব সময় করুণার দৃষ্টিতে দেখেছো। আমার মনের দাম তোমার কাছে তিল পরিমাণও নেই।

আপন, আমি কি তোমার জীবনে কচুর পাতায় দুই ফোটা জলের মতো?

একটা চিঠিতে লিখেছিলে, আমি যেন তোমাকে ভুলে যাই। আবার আরেকটিতে লিখেছিলে, আমি যদি তোমাকে চিঠি না লিখি অথবা খোজখবর না রাখি তাহলে তুমি অসহায় হয়ে যাবে। আসলে তোমার কথার কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল তুমিও জানো না। হ্যা, তুমি ঠিকই লিখেছিলে আমি প্রেম নামের যে চারা গাছ রোপণ করেছি সেটা শেষ বিন্দু দিয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করবো। কিন্তু আজ যখন দেখতে পাচ্ছি, যে মাটির উপর গাছ রোপণ করেছি সেই মাটিটুকুও আমার নিজস্ব নয় তখন কি ভাবে চারাগাছকে বাচাবো তুমিই বলো! মরুভূমিতে কি ভালো বৃক্ষ জন্মে?

তোমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আজও সেটা পালন করতে চেষ্টা করি। আমি তোমাকে বুঝি, অথচ তুমি আমাকে বোঝো না। এটা আমার চরম ব্যর্থতা। তোমাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। অবশেষে একটাই উত্তর পেয়েছি, তোমার বান্ধবী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। ভুল যেহেতু আমিই করেছিলাম তাই যতোই কষ্ট হোক আমাকেই ফিরে আসতে হবে। তবে কখনো তোমাকে ভুলতে পারবো না। তোমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে এটাই স্বাভাবিক। আগুনের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই।

আপন, অনধিকার চর্চা, তবুও বলছি, তোমার মাকে কষ্ট দিও না। মায়ের কথাগুলো মেনে চললে তুমি এবং তোমার মা দুজনেই ভালো থাকতে পারবে। তুমি সুখী হয়েছো শুনতে পেলে আমিও শান্তি পাবো।

আপন, মৃত্যুর আগে তোমাকে একবার দেখতে চাই। কি? খুব বেশি চেয়ে ফেলেছি? একবার আমার কথা ভেবে দেখো। যার সঙ্গে চিঠি, মোবাইলে এতো কথা হয়েছে, অথচ চোখে দেখবো না এটা কি হয়, তুমিই বলো? আমাকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু দিতে চাইলে আমার এই প্রত্যাশা পূরণ করো।

নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ভালো থেকো, সুখে থেকো। শুধু মনে রেখো, কেউ তোমাকে একদিন ভালোবেসেছিল খুব বিশ্বাস করে। তুমি তো খুব ব্যস্ত মানুষ। তাই আমাকে মনে রাখার জন্য বিশেষ মুহূর্ত লাগবে। অথচ এক সেকেন্ডের জন্য তোমাকে ভুলতে পারি না। অযথা আমার জন্য আর সময় নষ্ট করতে হবে না। তবুও তুমি সুখী হও। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন ফুলের মতো সুন্দর হোক।

রাজশাহী থেকে

জীবনসঙ্গী

– আজাদ রহমান চৌধুরী

আজ আমার সত্যিই ভাবতে অবাক লাগছে যে, দুষ্টুমি থেকে আমাদের সম্পর্ক এতোদূর এসে দাড়াবে। যে মেয়ের সঙ্গে একদিন শুধু মজা করতাম তাকে জীবনসঙ্গী বানাবো। আপনারা কি ভাবছেন সেই মেয়েটি কে? ধরুন সেই মেয়েটির নাম বৃষ্টি।

বৃষ্টি যখন এসএসসি পরীক্ষার্থী ঠিক তখন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে মেয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করতাম। আমাদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে বৃষ্টি আমাকে একটি চিঠি দেয়। চিঠিতে লেখা ছিল, দয়া করে আপনারা আমার ও আমার বান্ধবীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করবেন না। এসব ভালো ছেলেদের কাজ না।

তার পরদিন বৃষ্টির সঙ্গে দেখা করি। জিজ্ঞাসা করি, ভালো ছেলেদের কাজ কোনটি।

সে উত্তরে বলে, আপনার তো বোঝার বয়স হয়েছে। বোঝেন না? নাকি আমাকে বোঝাতে হবে।

বললাম, বুঝি, তবে...।

বৃষ্টি বললো, তবে কি?

তবে মন যে মানে না। মনটা চায় কাউকে ভালোবাসতে। আমার দুঃখ-বেদনা কারো সঙ্গে শেয়ার করতে। কিন্তু সেই মানুষ কই বলো?

বৃষ্টি বললো, কেন? আমার অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে। আপনি বলেন কি রকম মেয়েকে ভালোবাসবেন।

বললাম, যদি বলি তোমার মতো, পর্দানশীন, নিরহংকার একটা ভালো মেয়ে।

বৃষ্টি বললো, আমি ভালো, আপনাকে কে বলেছে?

ভালো হও, মন্দ হও, যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি। তখন কি তুমি আমাকে গ্রহণ করবে? আমি জানি তুমি পারবে না। জানি, আমার মতো ছেলেকে তুমি ভালোবাসতে পারবে না।

বৃষ্টি বললো, যদি বলি আপনার ধারণা ভুল। আমি আপনাকে ভালোবাসি।

আমি এতোক্ষণ তার সঙ্গে দুষ্টুমি করছিলাম। এবার যেন একটু সিরিয়াস হলাম। বললাম, সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো?

বৃষ্টি বললো সত্যিই আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি প্রথম দিন থেকেই।

তখন আমার অন্য রকম যেন মনে হলো এই পৃথিবীকে। দুনিয়া জয়ের আনন্দ যেন উপভোগ করলাম সেই মুহূর্তে আমি।

এরপর থেকে অনেকবার বৃষ্টির সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। প্রত্যেকবারই সে আমাকে উপদেশ দিতো যেন আমি ভালো পথে চলি। সিগারেট খেতাম যা বৃষ্টি একদমই পছন্দ করতো না।

বৃষ্টি বলতো, বিয়ের পর তো আমাকে চুলো জ্বালাতে হবে না।

বললাম, কেন?

বৃষ্টি বলতো, কেন মানে, দুনিয়ার সমস্ত আগুন তো আপনি সিগারেট খেয়ে শেষ করে ফেলেছেন। এসব যদি আমি আর দেখি তবে বিয়ের পর বেধে রাখবো আপনাকে।

বললাম, বেধে রাখলে কি হবে শুনি।

বৃষ্টি বললো, আর আপনি সিগারেট খেতে পারবেন না।

বললাম, ভালো কথা। তবে সিগারেটের পরিবর্তে কিছু দেবে না আমাকে।

বৃষ্টি বললো, কি দেবো শুনি? আপনি খুব দুষ্টু।

একবার বৃষ্টির আসতে দেরি হওয়ায় সিগারেট খাচ্ছিলাম।

সে হঠাৎ এসে আমাকে দেখে বললো, আপনি আবার সিগারেট খেয়েছেন। আজ আপনাকে আমি শাস্তি দেবো। চলুন আমার সঙ্গে। বলে রিকশায় তুলে নিল।

বললাম, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ।

সে বললো কেন, ভয় পাচ্ছেন? জেলে দেবো আপনাকে, আমার কাছ থেকে চুরি করে মনটাকে আগুনে পুড়িয়েছেন। তারপর সে একটি রেস্টুরেন্টের ক্যাবিনে নিয়ে বসালো। বললো, আপনি আসামি, একদম কথা বলবেন না। আমি যা করি শুধু দেখে চুপ করে তাকবেন। এরপর বিরিয়ানির প্লেটের সবটুকু এক এক করে আমাকে খাওয়ালো। রেস্টুরেন্টের বিল দিয়ে বের হলাম।

বললাম, এবার কি তাহলে পুলিশে দেবে।

বৃষ্টি বললো, আপনার কি বিশ্বাস, আমি আপনাকে পুলিশে দিতে পারবো। আপনার কোনো ক্ষতি হোক আমি তা কখনো চাইবো না। আমার জীবন থাকতে না।

এভাবে ভালোবেসে বৃষ্টি আমাকে সময় দিতে গিয়ে বৃষ্টির অনেক অসুবিধা হতো। কিন্তু বৃষ্টি তা কখনো আমাকে বুঝতে দেয়নি। সব সময় আমাকে বলতো, দয়া করে আপনি নামাজ পড়বেন। এমনি সে আমার কোনো বিপদ জানলে নামাজ পড়ে দোয়া করতো আমার জন্য।

মনপ্রাণ উজাড় করে যে আমাকে ভালোবেসেছে, তাকে জীবন সঙ্গিনী রূপে আমি পাবো না একি হতে পারে! তারপরও বৃষ্টি আর আমার জীবনে যে ভালোবাসার সূর্য অস্ত যেতে চায়নি তা নয়। বিপ্লবের একটি গানে আছে *ভালোবাসায় দুঃখ আছে রে, ভালোবাসায় সুখ আছে রে।* সেই দুঃখের ছাপ পড়লো আমার ভালোবাসায়। আমার বন্ধুর মাধ্যমে একজন নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হলো। জানতাম না সে বৃষ্টির ভাই।

তার কিছুদিন পর বৃষ্টি ও আমাকে দেখে ফেলে তার বড় ভাই। আমি ও বৃষ্টি কেউই তাকে খেয়াল করিনি। কারণ আমি বৃষ্টি তখন একে অন্যের স্বপ্নে বিভোর।

এর কিছুদিন পর বৃষ্টির ভাই মানে আমার বন্ধু বললো, দোস্ত, আমার একটা কথা রাখবি।

আমি তখনো জানতাম না সে বৃষ্টির বড় ভাই। বললাম, বল না।

সে বললো, আগে রাখবি কি না বল?

বললাম, অবশ্যই রাখবো।

সে বললো, তুই আমার বোনকে ছেড়ে দে।

আমি বুঝলাম না।

সে বললো, বৃষ্টি আমার বোন, আমি জানি সে তোকে খুব ভালোবাসে। তুই তাকে ভুলে যা।

বললাম, তোকে যখন কথা দিয়েছি অবশ্যই রাখবো।

কিছুদিন পর বৃষ্টির সঙ্গে আমার দেখা। বললাম, বৃষ্টি, তোমাকে আজ এমন কিছু কথা বলবো যা নির্মম হলেও বিশ্বাস করতে হবে। মানতে হবে আমার কথা।

বৃষ্টি বললো, আপনার কথা বিশ্বাস করবো না তা কেমন করে ভাবলেন। আপনার কথা আমার অবশ্যই মানতে হবে। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

বললাম, তোমার আর আমার সম্পর্ক তোমার বড় ভাই জেনে গেছে। তাছাড়া সে আমার বন্ধু। কয়েকদিন আগে তাকে কথা দিয়েছি, তোমাকে ভুলে যাবো।

সে বললো,আপনার কথায় আমাদের তিলে তিলে গড়া সম্পর্ক এভাবে শেষ হয়ে যাবে!

আমার তখন কান্না আসছে। কিন্তু নিজের অবস্থান আমাকে না কাদার অভিনয় করতে বাধ্য করেছে সেদিন। কারণ, আমি মেয়ে নই, ছেলে। কিন্তু ছেলে হলে কি হবে। মেয়েদের মতোই কান্না পাচ্ছে আমার। নিজের অজান্তেই যেন কেদে ফেলেছি কখন তা জানি না।

বললাম, তুমি আমার চেয়ে ভালো একজনকে জীবনসঙ্গী করে নিও।

সে বললো, কি বলছেন আপনি? মন দেয়া-নেয়া তো আমার পেশা নয়। এমনটাও নয় যে, আমি আপনাকে ভুলে যাওয়ার জন্য ভালোবেসেছি। জীবনে তো কিছুই চাইনি। শুধু আপনাকে চেয়েছিলাম। তাও যদি না পাই তাহলে আমার বেচে থাকার কোনো অধিকার নেই। মনে রাখবেন, বৃষ্টি শুধু একবারই ভালোবেসেছে এবং তা আপনাকে, কোনো কিছুর বিনিময়ে সে আপনাকে হারাতে পারবে না। কিন্তু সে এও পারবে না, আপনার কথার অবাধ্য হতে। সে আপনার কথা রাখবে। তবে অন্য কাউকে বিয়ে করে নয়। কাল যদি পারেন আমার জানাযায় আসবেন।

বললাম, তুমি আত্মহত্যা করবে? তুমি জানো না এটা পাপ!

সে তখন কাদছে। নদীর বহমান স্রোতের মতো করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে চোখ দিয়ে।

আমিও যেন সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

সে বললো, আমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। কিন্তু জানি, আমাকে জোর করা হবে অন্য কাউকে বিয়ে করতে।

আমি নিরুপায়। সে এমনভাবে কাদছে যে, শত চেষ্টা করেও তার কান্না থামাতে পারলাম না। বললাম, না বৃষ্টি, আমার কারণে তুমি মরতে পারো না। যতো বাধাই আসুক না কেন, তোমাকে জয় করে নেবো। তুমি শুধু আমার, আমারই থাকবে চিরকাল।

এ কথা শোনার পর বৃষ্টির কান্না মিশ্রিত চোখে মুখে হাসির ঝিলিক দেখতে পেলাম। এতেই যেন বৃষ্টিকে জয় করে নিলাম। এবং তাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে নেবো।

আমার এই ডায়রির লেখাগুলো বৃষ্টি পড়ছে আজ।

চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে

সবচাইতে বড়

– কামরুজ্জামান সৈকত

আগামী সপ্তাহে দুর্গাপূজা। তাই কলেজ বন্ধ। দুর্গা উৎসব দেখার আমন্ত্রণ পেলাম লক্ষ্মীর কাছ থেকে। লক্ষ্মীর ইচ্ছা, দুর্গাপূজা চলাকালে প্রতিদিন বিকেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে।

লক্ষ্মীর অবাক করা ইচ্ছার কথা শুনে আমি হতবাক।

সে বললো, কি হলো, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?

বললাম, থাকবো না মানে, তুমি বললে তো থাকতেই হবে।

আশ্বিনের ১৫ তারিখ বিকাল পাচটায় তুমি থাকবে আমাদের বণিক পাড়ায়।

লক্ষ্মীর কথা অনুযায়ী বিকাল পাচটায় আমি বণিকপাড়ায়।

সে যেন আমার অপেক্ষায়ই ছিল। বাড়ির গেট থেকে বের হয়েই বললো, দ্রুত রিকশা নাও।

রিকশা নিলাম এবং ছুটলাম পূজামণ্ডপের দিকে।

তার শরীরের সুগন্ধিতে চেয়ে রইলাম তার চোখের দিকে।

হঠাৎ সে বললো, কি হচ্ছে? কি দেখছো?

বললাম, তোমাকে।

লক্ষ্মী বললো, কি আছে আমার মধ্যে?

থাক, অন্য দিন নাহয় এর উত্তর দেবো।

রিকশা পৌছে গেল গন্তব্যে। রঙিন লাইটে সাজানো পূজামণ্ডপ যেন ঝলমল করছে।

লক্ষ্মী হঠাৎ করে আমার হাত ধরলো।

বললো, চলো ভেতরে।

অনেক লোকের মাঝে মিশে গেলাম দুজন।

লক্ষ্মী ভেতরে ঢুকে দুর্গাকে প্রণাম করলো।

এরপর দুজন পূজামণ্ডপ থেকে বের হয়ে হয়ে *হোটেল রয়াল*-এ গেলাম।

মোগলাই খেতে খেতে লক্ষ্মী জানতে চাইলো, পূজা দেখতে কেমন লাগলো? আগে কখনো দেখেছো?

বললাম, দেখতে বেশ ভালোই লাগলো। তবে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

চলো, রাত হয়েছে অনেক, এখন বাড়ি ফিরি, কাল একই সময় তুমি আসছো। ঠিক আছে তো?

হ্যা, ঠিক আছে। চলো তোমাকে পৌছে দিই। আবার রিকশা নিলাম।

রিকশায় বসে লক্ষ্মী বললো, জানো, আমার অনেক বন্ধু আছে। তার মধ্যে তোমাকে শুধু বিশ্বাস করি। তাই তো তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছি। জানি, তোমার ধর্ম ইসলাম। তবুও তোমাকে বিশ্বাস করি এবং ভালোবাসি।

তুমি কি বলছো, পাগল হলে নাকি? তুমি কতো বড় ঘরের সন্তান, সমাজে তোমাদের অবস্থান উচু। তুমি কেন গরিব মুসলমান ছেলেকে ভালোবাসতে যাবে?

তুমি আমাদের কলেজের ভালো ছাত্র, তোমার ভবিষ্যৎ সুন্দর, তোমার আচার-আচরণ, বিবেক-বুদ্ধি সবই আছে। কি নেই তোমার? লক্ষ্মী একদমে সব কথাগুলো বলে শেষ করলো।

লক্ষ্মী, আবেগের বশে তুমি এসব বলছো। বাস্তব বড় কঠিন।

যতো কঠিন হোক, আমি জয়ী হবো। শুধু তুমি আমার পাশে থেকো।

লক্ষ্মীদের বাড়ির সামনে রিকশা থামলো।

সে বললো, বাড়িটা আরো দূরে হলে ভালো হতো। আরো কিছু সময় তোমাকে কাছে পেতাম। আজ আসি, গুড নাইট।

পরদিন আবার ঘুরতে বের হলাম। আজ পূজামণ্ডপে নয়। আজ চলে গেলাম মেঘনা নদীর কাছে। মেঘনায় পরিত্যক্ত একটি জাহাজের ওপর বসে কথা বলছি। মেঘনায় প্রচণ্ড ঢেউ আর বাতাস। সেই বাতাস লক্ষ্মীর চুল ও শাড়ির আচল ওড়ায়।

লক্ষ্মী আমার হাটুর ওপর মাথা রেখে বলে, তুমি তো বললে না আমাকে ভালোবাসো কি না?

অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু লক্ষ্মী, তুমি তো জানো, তোমার-আমার ব্যবধান ধর্মের। এ ব্যবধান খুবই মজবুত। দুঃখ-কষ্ট সইতে হবে। হয়তো হাসিমুখে মেনে নিতে হবে মৃত্যুকে। তুমি পারবে লক্ষ্মী?

হ্যা, কেন পারবো না? অবশ্যই পারবো। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।

আমার ও লক্ষ্মীর প্রকাশ্যে চলাফেরার কারণে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো ভালোবাসার কথা। ওর কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো নির্যাতন।

লক্ষ্মী থাকে অনড়। বাবা-মায়ের কাছে ওর সাফ কথা, আমাকে মেরে ফেললেও আমি ভালোবাসবো। লক্ষ্মী ধর্ম ছাড়তে রাজি। কিন্তু আমাকে নয়।

অবশেষে বাবা-মায়ের বেধড়ক মারধরে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লো লক্ষ্মী। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। দুদিন পর এক নার্সের সহযোগিতায় হাসপাতাল থেকে লক্ষ্মীকে নিয়ে পালিয়ে যাই। লক্ষ্মী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। অবশেষে কোর্টে আমাদের বিয়ে হলো। লক্ষ্মীর বাবা-মা আর বাড়াবাড়ি করলেন না।

আমাকে পেতে এবং ভালোবাসাকে জয় করতে লক্ষ্মী হারালো বাবা-মাকে ও নিজ ধর্মকে। লক্ষ্মীর কথা, উপরওয়ালা যেমন সত্যি তেমনি তোমার-আমার ভালোবাসা সত্যি।

বিশ্বাস আমাদের জয়ের মুখ দেখালো।

সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মের চেয়েও ভালোবাসা বড়।

ভোলা থেকে

বিরক্তিকর

– পলিন

যখন ক্লাস ফোরের ছাত্রী ছিলাম তখন *ভালোবাসা* শব্দটার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম। তখন নিয়মিত স্কুল যাতায়াত করতাম। আমাদের বাসার সঙ্গেই ছিল মসজিদ। মসজিদের ইমাম আমার বাবার পরিচিত বলে আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে তার পরিচিতি ছিল। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি প্রায়ই আমাকে ডাকতেন। কিন্তু আমি কখনোই তার কাছে যেতাম না।

একদিন দুপুরে যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন তিনি ফুলের লোভ দেখিয়ে আমাকে তার রুমে নিয়ে গেলেন। তখন দরজা আটকে দিলেন জানালার পর্দা ফেলে দিলেন। কাধে থেকে স্কুল ব্যাগটা রেখে সে বাইরে গিয়ে আমাকে ফুল এনে দিলেন। আমি যাওয়ার কথা বললে আমাকে বিছানায় তার কোলের ওপর বসতে বললেন। আমি কিছু না বুঝে বসলাম। তারপর তিনি আমার প্যান্ট খুলে আমার নিতম্বকে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরলেন এবং তার উরুর সঙ্গে আমাকে লাগিয়ে জোরে জোরে ঘষা দিলেন। জিজ্ঞাসা করলো, আরাম পাচ্ছি কি না। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আমাকে চুমু দিয়ে চলে যেতে বললেন।

তখন থেকে আমি পয়ষট্টি বছর বয়স্ক হুজুরকে দেখলেই ভয় পেতাম।

এর ঠিক বছর খানেক পরের ঘটনা। আমাদের বাসায় গিয়ে আমার মাকে রাজি করালেন আমাকে তিনি আরবি পড়াবেন। যখন তার কাছে পড়তে যেতাম তখন তিনি মাঝে মধ্যে চিমটি দিতেন, পা দিয়ে গুতো দিতেন আর ইচ্ছা করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।

তারপর একদিন রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি আমার স্তন ধরে জোরে চাপ দিলেন। আর বললেন, কি, কেমন লাগে? মাঝে মধ্যে তিনি আমাকে জামা উঠিয়ে স্তন দেখাতে বলতেন।

আস্তে আস্তে যখন আমি বড় হতে থাকি ততোই তার প্রতি আমার ঘৃণা বাড়তে থাকে। কারণ তার মতো একজন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মনের মধ্যে কুকর্ম লুকিয়ে থাকতে পারে তা কারোরই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তখন থেকেই পুরুষদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জাগতে থাকে।

এটা আরো অনেক ঘটনার মধ্য কয়েকটা। যখন আমি হাই স্কুলে উন্নীত হলাম তারই একটা ঘটনা। আমি দেখতে হালকা ফর্শা, স্লিম, উন্নত গঠনের বলে এক নজরেই সবার চোখে পড়তাম। একটু চঞ্চল প্রকৃতির থাকায় সবাই আমাকে পছন্দ করতো।

একদিন দুপুর বেলায় আমার ছোট মামাতো ভাই এসে হাজির। সে সব সময় মনে মনে আমাকে চাইতো। কিন্তু আমি তা বুঝিনি। সব সময় তার সঙ্গে হাসতে হাসতে কথা বলতাম এবং আহ্লাদি মেয়ে বলে কথায় কথায় রাগ ও ঢঙ করতাম।

একদিন সে আমার কাছে এসে তার উরুটা দেখালো এবং বললো ধরে দেখতে কেমন মোটা ও সতেজ। আমি ধরলাম না।

এবার সে বললো, তোমারটা দেখাওতো।

বললাম, দেখাবো না।

সে আবার অনুরোধ করলো।

আমি অনড়। সেদিন সে আমাকে জোর করে কিছু করতে সাহস পায়নি। কারণ অন্য রুমে আমার মা বসেছিলেন।

যখন তাদের বাড়ি যেতাম তখন সে প্রায়ই আমাকে কোলে নিতো। এবং তার উরুর মাঝখানে আমার নিতম্বকে রেখে জোরে চাপ দিতো আর শক্ত করে আমাকে ধরে রাখতো।

আমি তার কোলে থেকে নামতে চাইলেও সে আমাকে নামাতো না। তারপর আমি জোর করে নেমে পড়তাম।

আমি এখন এইচএসসি পাস করেছি।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে পুরুষদের আচরণের প্রতি খুবই ঘৃণিত ভাব প্রকাশ করছি। আমার মনে হয় কোনো পুরুষেরই উন্নত ধরনের চিন্তা ও মন নেই। তারা সবাই সমান। ছোট থেকে এই পর্যন্ত যতো ছেলে আমাকে পেতে চেয়েছিল এবং এখনো পেতে চাইছে তাদের কাউকে এখন আমার ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে দিই না।

হ্যা, অনেকের সঙ্গেই এখনো কথা বলি। তবে তা নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট প্রয়োজনে। কেননা অনেকে আমাকে না দেখে বারান্দায় বের করা আঙুল দেখেও আমাকে চিঠি লিখছে। দুঃখের ব্যাপার এই যে, একটা চিঠি আজ পর্যন্ত পড়তে পারিনি। কেননা তা আমার হাতে আসার আগেই আমার ভাই-বোনরা পড়ে টুকরো করে ফেলে।

আমি জানি আমার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই এবং আমার পাড়া প্রতিবেশী ভাইয়েরা আমাকে মনে মনে এখনো চায়। আমি তাদের কাছে যা আবদার করি তারা তা আমাকে পূরণ করে দেয়।

তারা এতো চেষ্টা করেও আমার মন পায় না। তাদেরকে আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাতে রাখি। তারপর সবাইকে লাটিমের মতো ঘোরাই। কেননা কোনো পুরুষের কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বিয়ের জন্য আমার মা কারো ছবি দেখালে মনে হয় তারা কি সেসব ঘৃণিত পুরুষ? নাকি আমার মনের মতো পুরুষ?

ঢাকা থেকে

শুধুই তুমি

– ঝর্না

যখন কলেজে পড়তাম তখন কতো রঙিন স্বপ্ন দেখতাম। অবশ্য বেশির ভাগ স্বপ্নই ছিল বিয়ে সংক্রান্ত। বিয়ের পর কি কি করবো। যেমন স্বামীর সঙ্গে একুশের বইমেলা-য় যাবো, বেছে বেছে পছন্দের বই কিনবো, কবিতার ক্যাসেট কিনবো, ফুচকা খাবো, নরম ঘাসে বসে বাদাম খাবো, বেইলি রোডে নাটক দেখবো, প্রকৃতির খুব কাছাকছি গিয়ে দুজনে হাত ধরাধরি করে হাটবো। অবশেষে বাসায় গিয়ে কবিতা শুনবো আর হুমায়ূন আহমেদের কোনো উপন্যাস হাতে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেবো। আহা! কি মজারই না ছিল সে স্বপ্নগুলো।

বিয়ের পর কিছুদিন ভালোই কাটলো। তারপর শুরু হলো স্বপ্ন ভঙ্গের পালা। সাংসারিক জটিলতা আর কুটিলতার মাঝে ভেসে গেলাম বার বার। আহত হলো হৃদয়। বাস্তবতা ও স্বপ্ন যে এক নয় তা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। জীবনে যা কিছু চেয়েছি তার কিছুই পাইনি। স্বপ্নের এক কানাকড়িও পূরণ হয়নি। এবং যা পেয়েছি তা হলো সুন্দর মনের একজন মানুষ। বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যার অন্তরের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। নিকটজনদের কাছ থেকে বার বার আঘাত পেয়ে যখন মুষড়ে পড়েছি তখন তার কাছ থেকে পেয়েছি সান্ত্বনা ও সহানুভূতি।

পাইনি অনেক কিছুই। এর জন্য মাঝে মধ্যে আফসোস হয় বটে কিন্তু সে আফসোস দীর্ঘ স্থায়ী হয় না। বাস্তবতা বড় কঠিন। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠে না। তবুও মাঝে মধ্যে রাগ করে বলি, মুখে শুধু ভালোবাসার কথা বললে হয় না, কাজেও দেখাতে হয়। পরক্ষণেই তার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে লজ্জিত হই। সাধ আছে, সাধ্য নেই আর কি!

সে যখন খুব সুন্দর করে আমাকে বলে, বৌ, তুমি তো জানো না আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি, আমার অন্তরের কতোখানি জায়গা জুড়ে তুমি আছো তখন শুনতে কি যে ভালো লাগে আমার!

কথাগুলো অন্তর থেকে বলা, না আমাকে খুশি করার জন্য বলা যাচাই করতে ইচ্ছা করে না। মনে মনে বলি, হোক না মিথ্যা কিংবা সত্যি, তবুও কয়জন এভাবে বলতে পারে! এর উত্তরে আমিও কিছু বলতে চাই। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারি না। কেমন যেন লজ্জা করে।

বিয়ের দশ বছর পর যাযাদির মাধ্যমে আজ তাকে জানাতে চাই, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি ফারুক, আই লাভ ইউ। আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে তুমি, শুধুই তুমি।

গোড়ান, ঢাকা থেকে

চন্দনের টিপে

– মোহাম্মদ আলী স্বপন

জীবনটা যে সত্যিই নাটকীয় তা প্রমাণিত হলো এই আমার ছোট্ট জীবনে।

আমি থাকি বারান্দায়। ছোট একটি রুমে। যা কি না খুপরির মতো। এখানে আছে সিঙ্গল চৌকি এবং একটা পুরনো আমলের কাঠের টেবিল। আমার অবশ্য এতে কোনো অসুবিধা হয় না। রাত গভীর হলে বাসায় ফিরি। তারপর লম্বা একটি ঘুম।

আমার কোনো কিছুতেই অসুবিধা হয় না। কেমন করে জানি সব কিছু আমার সঙ্গে মানিয়ে যায়। প্রথম প্রথম চৌকিতে পড়ে থাকা আধছেড়া তোষক থেকে ছারপোকা কামড়াতো সঙ্গে চিরশত্রু ডেঙ্গুর এডিস মশা কি না জানি না। তারা কানের পাশে এসে *ভুলো না ভুলো না* গান করে। বাইরে থেকে ঘরে এলেই বুকের পশম বেয়ে মাথার চুল বেয়ে দর দর ঘাম পড়ে। ঘামে শার্টের কলার ভিজে যায়। এক সময় লোমকূপের বাইরে শাদা লবণ হয়ে জমে থাকে।

মুখের দাড়িগুলো লম্বা হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। গোড়া দিয়ে শাদা শাদা কি যেন বের হয়। ফলে চুলকায়। কেউ কেউ আজকাল দেবদাস ডাকে পেছন থেকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না।

প্রায় দিন মা আমার ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন আর বলেন, কোনো চিন্তা করিস না বাবা, তোর সুদিন আসবে। আল্লাহ তোকে প্রচুর টাকার মালিক বানাবে শান্তিতে রাখবে।

মাকে কোনো উত্তর দিই না। মায়ের সঙ্গে কোনো কথা আমার সহজে বলা হয় না। মা যে আমার চিরদুঃখী। মায়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে থেকে বাবা গাজা, ভাং, ডাইল খেতেন। তাই সুন্দর কনে দেখে বাবাকে বিয়ে

দিলেন ভালো হওয়ার জন্য, সংসারি হওয়ার জন্য। কিন্তু না, আজ মাঝে মধ্যে পাশের ঘর থেকে বাবার চেচামেচি, বেশির ভাগই মাকে উদ্দেশ্য করে। তার চেচামেচির ভাষ্য হচ্ছে, তাকে মা কেন গাজা কেনার টাকা দেন না।

বাবা পৃথিবীর সর্বনিম্ন শ্রেণীর কিছু ইতর প্রাণীদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি ও আড্ডা মারেন। টাকা না পাওয়ার আগ পর্যন্ত মাকে খানকি মাগি, ফকিন্নির বাচ্চা ইত্যাদি তার প্রতিদিনের গালি। আমি নাকি ফকিন্নির বেডির মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

গাজা খাওয়ার পর বাবা খুব ভালো কথা বলেন। নেশা কেটে যাবার পর শেখ হাসিনার মতো কথা বলেন। চেচামেচি, গালাগালি শুনলে আমার তখন মরে যেতে ইচ্ছা হয়। না পারি বাবাকে নেশা নামের মরণ ব্যাধি থেকে ফেরাতে, না পারি মাকে শান্তি দিতে এক পরশ। বাবা সোনাকান্দি নামের গ্রামে গিয়ে নেশা করেন।

ছোট ভাই মোমেন, বোন রোজি আর সোহাগ। অভাবের সংসার সবাই রোজগার বিহীন। বাবার আয়ের উৎস আমাদের ১৫ বিঘা জমি। জমি থেকে অনেক কষ্টে যা ধান পাই তা দিয়ে কোনো রকম করে বছরের ভাত হয় এবং পাট, পাটখড়ি, দইনছা, মাসকলাই বিক্রি করে। বাবার কাজ সকাল বিকেল গাজা খাওয়া, আড্ডা মারা, মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরা। এসব অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, সঞ্চিত দুঃখগুলো নিয়ে অন্ধকারে চিৎপটাং হয়ে থাকি। শুয়ে শুয়ে আল্লাহ কবে সিংগাপুর নেবে সে স্বপ্ন দেখি। এক সময় মাথাটা শূন্য হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ি।

আজকাল ইচ্ছাগুলো ক্রমে মরীচিকা হয়ে মরে যাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল যখন শাহীনা নামটা শুনলেই বুকের ভেতর যেন কেমন করে উঠতো, আমার জীবনে প্রথম ভালোবাসার সুবাতাস বইতে শুরু করেছিল ঠিক তখন থেকে তাকে দেখার জন্য সব সময় উন্মাদ হয়ে থাকতাম। প্রায়ই অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতাম অবাক বিস্ময়ে। উজ্জ্বল বরণ, গভীর কালো দুটো চোখ ফেলা উষ্ণ চুমুর অপেক্ষায়। অমাবস্যার আধারসম বিস্তৃত এলোমেলো চুল সব মিলিয়ে হৃদয়ে এক মাদক দোলা দিয়েছিল যার স্মৃতি আজ দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসে।

গত জুনের কোনো একদিনে তার সঙ্গে দেখা তার চাচার বাড়িতে।

দেখতেই কাছে এসে মৃদু করে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো?

আমার কোনো জবাব দিতে হলো না। জবাব দিয়ে দিল আমার ছল ছল করা দুটো চোখ। কেমন করে যেন অশ্রু বেরিয়ে গেল।

আমার চোখের পানিটুকু সে স্পর্শ করতে পারলো না। শুধু চাপা স্বরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বললো, তোমাকে আজও ভালোবাসি স্বপন।

না, বলতে, পারিনি আমিও তোমাকে ভালোবাসি। গত দিনের চেয়ে বেশি আমার সকল অনুভূতির অংশীদার তুমি। ভালো লাগা, মন্দ লাগা সব তুমি। তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়, অফুরন্ত সুন্দরের সন্ধান করতে প্রেরণা যোগায়। তোমার প্রতি আমার মোহমায়া, আকর্ষণ, টান যাই বলি না কেন, সব কিছুই তীব্র। তোমার কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। স্বপ্নের অট্টালিকা গড়ি।

গত নভেম্বরে নাকি তার বিয়ে হয়ে গেছে এক চাষীর ছেলের সঙ্গে। শুনতেই চর জেগে ওঠার মতো বেদনায় চৌচির হয়েছি। আমার বেচে থাকার স্বপ্নটুকু হারিয়েছি। আমার সমস্ত শূন্যতার ফোকড় দিয়ে পানি গড়িয়েছে টুপ টুপ করে। তাকে ছাড়া আমার পৃথিবীটা শূন্য মরুভূমির মতো। নিঃসঙ্গতা আমাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে থাকে।

আকাশ, বাতাস, স্রোত, ঝরনা সব কিছুই চলছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু আমার মাঝে বিরাজ করছে একাকীত্বের অস্বাভাবিকতার উদাস করা দুপুর কিংবা মধ্যরাতের আকাশে। তারাগুলোর দিকে তাকালে দুই

চোখের জানালা দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে গুমরে ওঠে বুকটা। মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ আমি। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, আমার জীবনটা কেন এ রকম? কেন?

বিবেকহীন মাতাল পিতার সন্তান হয়ে জন্মেছিলাম। যেখানে প্রতিদিন বাবা নামের নরপশু মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে, মাকে লাথি মারে সেখানে শাহীনার জ্যোৎস্না মাখা মুখ আর শাড়ির আচল, কাচের চুড়ি, চন্দনের টিপে সাজাতে পারতাম না। তাই আল্লাহতাআলা আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে নিয়েছে তাকে। হারানোর নীরব–নিকষ অন্ধকারে মৃত্যুর সঙ্গে খেলি। এসবের যন্ত্রণায় দিনের পর দিন দগ্ধ হতে থাকলাম। এখন আমার পায়ের তলার মাটি নেই। আছে শুধু অসহায় বোবা দৃষ্টি।

নিলশ্যাবীরগাও, নরসিংদী থেকে

তুলনাহীন

– শামীম ডি কস্টা

চমৎকার ফিগার আর খুব সেক্সি সে। দেখলেই শুধু পেতে ইচ্ছা হয়।

সেই প্রথম দিন। সত্য ও সুন্দর ভালোবাসারও নির্দশন বটে। মেয়েটির ডাক নাম অর্পিতা। আমায় ভালোবাসে অনেক আদর দেয়। দেখে মনে হয় অনেক সাহসী মেয়ে। আসলে ভীতুর ডিম।

মাস কয়েক আগে যখন সে আমার বাসায় বেড়াতে এলো তখন বাসায় কেউ ছিল না। চৈত্রের দুপুর।

আমি কাছে গিয়ে বসতেই বললো, এতো কাছে বসবো না। কেউ চলে আসবে।

বললাম, আরে পাগলি মেয়ে, আজ কেউ নেই। তোমার একটু আদর করবো।

না আমার ভয় লাগে।

না, কিছু হবে না। আমার কি অনেক.. ইচ্ছা করে না?

বেশ। তবে মাত্র একটা কিস করবে।

রাজি হয়ে তার সাগরের ঢেউয়ে হাত এলোমেলো করে দিয়ে ঠোট চুষে ধরলাম। তারপর অর্পিতা যেন শরীর মেলে দিল। আমিও কামনায় পাগল হয়ে তার সব কিছু খুলে, ঠোটে বিষ ঢেলে দিয়ে অথৈ সাগরে গোসল করলাম। ক্লান্ত হয়ে পড়ে রইলাম দুজন কিছুক্ষণ।

প্রথম মিলন তুলনাহীন! কিন্তু দেখি বিছানার চাদর রক্তে ভিজে গেছে। খুব ভয় পেয়েছিলাম দুজনেই।

এখনো অনেক আদর, অনেক ভালোবাসা আর অনেক মিলনের মাঝে দিন কাটে। তবে প্রথম মিলনের চরম যাতনার কথা এখনো জিভে লেগে আছে।

দেবিসিংপাড়া, রাজশাহী থেকে

প্রশ্নবোধক

– এম.এস.ইউ. ভূঞা

বড় ভাই এবং ভাবী কেন যে আমার বিরুদ্ধে এমন ভয়াবহ রকমের খড়গ হস্ত হলেন তা আজও আমার জীবনে বিশাল এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাড়িয়ে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দাত বের করে হাসছে। আমার একটি মাত্র দোষ ছিল। তা হলো অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। প্রচলিত অর্থে প্রেম বলতে যা বোঝায়, ব্যাপারটা ঠিক সে রকমও ছিল না। তারপরও আমার ভাই–ভাবীর মন জয় করতে পারিনি।

সুন্দরীদের হৃদয় নাকি কয়েক হাজার ফ্যাদম গভীর হয়। সেখান থেকে মণি–মুক্তা আনা নাকি গলিত টুইন টাওয়ার পুনরায় দাড় করানোর চেয়েও কঠিন। অথচ ভাই–ভাবীর কাছে সেই অসাধ্য সাধনের বীর পুরুষ পরাভূত হয়ে অবশেষে *কাপুরুষ* খেতাব নিয়ে জীবনের বোঝা বয়ে চলছি দিনের পর দিন।

ঘটনাটা খুলেই বলি। লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করছি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে। থাকি নারায়ণগঞ্জে বড় ভাইয়ের বাসায়। অফিস ঢাকাতে। প্রতিদিন সাতসকালে বাসা থেকে বের হই। বাসায় ফিরি বেশ রাত করে। সকালে মশারি থেকে বের হয়ে আসি আর রাতে গিয়ে আবার মশারিতে ঢুকি। প্রেম করার মতো সময় এবং মানসিকতা কোনোটিই আমার অনুকূলে নয়। এমনকি যে বিল্ডিংয়ে বাস করি, তার সব কয়টি বাসিন্দাকেও চিনি না। আসতে ও যেতে সিড়িতে ওই বিল্ডিংয়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে টুকটাক দেখা–সাক্ষাৎ হতো। আমার পরিচয়ের দৌড় ওটুকুই। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই যে সুনামটির কারণে সকলের প্রিয় ছিলাম তা হচ্ছে আমার ভদ্র, মার্জিত আচরণ। কারো সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথা বলতাম না, অথচ কেউ আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে সে আমাকে *অহংকারী* বলে অপবাদ দিতে পারতো না।

আমরা থাকতাম তিন তলায়। অফিসে যাবার জন্য একদিন সকালে সিড়ি দিয়ে নামছি। নিচ তলার সর্বশেষ ধাপ অতিক্রম করার পর কোনো কারণ ছাড়াই বাম দিকে তাকিয়ে দেখি পনেরো ষোল বছরের একটি তাজা গোলাপ। সরি, ভুল বললাম। অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে মোড়া পেতে বসে আছে। ডাগর ডাগর চোখের এক পলকের চাউনি ক্ষণিকের জন্য হলেও বুকের কোথায় যেন একটু ছলকে উঠলো। আমাদের বিল্ডিংয়ের বাম দিকে এক তলা একটি এক্সটেনশন হয়েছিল। বোধ করি মেয়েটি ওই বাসার বাসিন্দা। কোনো কথা না বলে আমি অফিসে চলে গেলাম।

পরদিন অফিসে যাবার সময় একই ঘটনা ঘটলো। সিড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করে বাম দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। সে বসে আছে। গতকালের মতো হঠাৎ তাকানো নয়, অনেকটা চোরা চাউনি দুজনেরই। আগের দিনের চেয়ে আরো আকর্ষণীয় মনে হলো। তাকালাম এবং চলে গেলাম। সকাল বেলা চলন্ত অবস্থায় এক সেকেন্ডের জন্য তাকানো, অতঃপর চলে যাওয়া এবং কেউ কোনো কথা না বলা প্রতিদিনের একটি রুটিন ওয়ার্ক হয়ে গেল।

ভদ্র বা মার্জিত ছিলাম। কিন্তু সাধু–সন্ন্যাস তো ছিলাম না। তবে তা প্রতিদিন একবার করে তাকানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবে পার হলে গেল বেশ কিছুদিন।

একদিন ব্যতিক্রম হলো। সে ছিল না। আমিও একবার তাকিয়ে গেট থেকে বের হয়েই রিকশায় উঠলাম। উঠেই বুঝতে পারলাম কেউ আমাকে পেছন থেকে ডাকছে।

তাকিয়ে দেখি তার ছোট ভাই। আমার হাতে ছোট একটি চিরকুট দিয়েই ভোদৌড়। গোটা গোটা হাতে লেখা দুই লাইনের একটি ছোট্ট চিঠি। *আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান? অনায়াসে বলতে পারেন। তাতে আমিও রেহাই পাবো, আপনিও পাবেন।*

বার বার পড়লাম, অনেকবার পড়লাম, সহস্রবার পড়লাম। কোনো কাব্য ভাব নেই, ভাষার কারুকার্যমণ্ডিত কোনো গাথুনি নেই, সরাসরি কোনো প্রেম নিবেদনও নেই। অতি সাধারণ একটি চিঠি। অথচ যতো পড়ি ততোই ভালোলাগে। আমিও ততোধিক ছোট একটি প্রত্যুত্তর লিখলাম। *অপেক্ষা করো, আমি পারিবারিকভাবে তোমাকে নেয়ার ব্যবস্থা করছি।*

পরদিন সকালে তার হাতে দিলাম। বলা বাহুল্য, আমার লেখা চিঠিটির একটি ফটোকপিও রাখলাম। পরের দিন ভাবীর কাছেও বলে ফেললাম এবং চিঠির কপিটি দেখালাম।

এরপর শুরু হলো আমার আনন্দময় জীবন। যে ব্যক্তি জীবনে কোনোদিন প্রেমে পড়েনি তাকে কোনোক্রমেই বোঝানো যাবে না সে কি অপার আনন্দে আমার দিনগুলো কাটছিল। আমার কাঠখোট্টা মরুময় হৃদয়ে যেন

প্রবল বেগে আনন্দের জোয়ার এসে গেল। স্বল্পভাষী মানুষটা হঠাৎ করে বেশি কথার চ্যাটারবক্স (Chatterbox) হয়ে গেলাম।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেমন করে জানি তার প্রসঙ্গ চলে আসে। এক কান, দুই কান হয়ে আমার মা, বড় ভাইসহ আত্মীয়স্বজন সবাই জেনে গেল। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রথমে আমার বড় ভাই এবং পরে ভাবীও বেকে বসলেন। মাকেও তাদের দলে টানলেন। মা অবশ্য গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। তিনি সব কথা জানতেন না। ফলে শুরু হলো আমার অভিসার। এ খবরও একদিন জানাজানি হয়ে গেল।

বাসায় আমার সঙ্গে ভাবী আগের মতো ব্যবহার করেন না। আমাকে দেখলেই চেহারায় একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তোলেন। বাসায় বাস করাই আমার জন্য কঠিন হয়ে গেল।

একদিন সকালে অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি। ভাবী এসে আমার সঙ্গে যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ ব্যবহার করলেন। এক পর্যায়ে নাক মুখ খিচিয়ে, আঙুল বাকিয়ে, স্ফুটে এবং অস্ফুটে যা বললেন তার মমার্থ হচ্ছে, আমাকে এক্ষুণি না খেয়ে বাসা থেকে চিরতরে চলে যেতে হবে।

যে ভাবীকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতাম তার কাছ থেকে এতো বড় অপমান সইতে না পেরে এক বস্ত্রে বের হয়ে এলাম। তাকে বলার কোনো সুযোগ পাইনি। ঢাকা এসে একটা আবাসিক হোটেলে উঠলাম। এর কয়েকদিন পরেই ছিল ঈদ। বাড়িতে গিয়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। মা আমার বড় ভাইয়ের কথায় অনড়। কারণ বড় ভাইয়ের টাকায় সংসার চলে।

কোনোদিন মায়ের মনে কষ্ট দিইনি। এবারও অবাধ্য হতে পারলাম না।

...কে বলছি, যদি পারো ক্ষমা করে দিও। ভালোবাসা দিবস যেন কারো জন্য কোনো বেদনা বয়ে না আনে সেই কামনা করছি।

ঢাকা থেকে

নির্জন উপকূলে

– ময়না

পারিবারিকভাবেই তার সঙ্গে পরিচয়। মাঝে মধ্যে দেখা হতো, ফোনে কথা হতো এটুকুই। কিন্তু তখন কখনোই ভাবিনি যে, এ লোকটার জন্য আমার এমন কষ্ট হবে। আমার মধ্যে এমন পরিবর্তন আসবে। আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। আমার এতোদিনের যত্ন করে লালন করা ব্যক্তিত্ব, অহংকার, ভালোবাসা, ধর্ম সব কিছুই তার মাঝে হারিয়ে যাবে।

শুরুটা তার দিক থেকেই হয়েছিল। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে তাকে তুমি করে সম্বোধন করেছিলাম। হয়তো আমার সেই সম্বোধন থেকেই তার মনে আগুন নিয়ে খেলার সূচনা। ওই মুহূর্ত থেকেই হয়তো তার মনে আমাকে ভালোবাসার, কাছে পাবার ইচ্ছা জেগেছিল।

না, কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে ভালোবাসার কথা জানাননি তিনি। শুধু বলেছিলেন, রাতে ফোন করো, দুই দিন ধরে ফোন করো না কেন?

কয়েকদিন পর তার কাছ থেকে স্নেহভরা একটা সুন্দর গিফট পেলাম। তারপর থেকে প্রতিদিনই ফোনে কথা হতে। তার কষ্ট, অপূর্ণ জীবন, আমার সম্পর্কে তার নানান প্রশ্ন এসব নিয়ে ।

আই লাভ ইউ বা আই মিস ইউ এ ধরনের কিছু তিনি আমাকে বলেননি ঠিকই কিন্তু তার মনের কথাটা বুঝতে আমার মোটেও অসুবিধা হয়নি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গিফটের সঙ্গে পাওয়া স্নেহ আমার মধ্যে ভালোবাসায় রূপ নিল। এক রাতে তার জন্য বুকে খুব কষ্ট হলো। সকালে ফোনে দেখা করার কথা বললাম।

না, সেদিন আমার জন্য ফুল নিয়ে সে আসেনি। কিন্তু যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছিল। আর সেই থেকেই শুরু।

তারপর কিভাবে কেটে গেল দশটা দিন, কাছাকাছি থাকা, গল্প করা, গান শোনা, সামান্য ছোয়ায় ভরে যেতো আমার মন। আমার প্রতি তার মনোযোগ আমাকে মুগ্ধ করতো সবচেয়ে বেশি। তার কাছ থেকে বাড়িতে ফিরে এসেও ফোনে গলার আওয়াজ শোনার জন্য অস্থির হয়ে থাকতাম।

আমার রুটিন জীবন পাল্টে গেল। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

সে ফোনে বললো, আমি এসে খাইয়ে দিয়ে যাবো ময়না?

আমি এক সময় তার ময়না, এক সময় জান।

আমার মোবাইলে... নাম্বারটা এলেই মনে হয় আমার জানের ফোন।

শুনে আমি তৃপ্তির হাসি হেসেছিলাম। কখনো নামের সঙ্গে যোগ করতো মণি। একদিন রাগ করে বললাম, বাবু বলো কেন?

তার উত্তরে আমাকে বললো, আদর করে ডাকি।

সে আমার কাছে শুধু ভালোবাসা চেয়েছিল। বার বার শুধু বলতো, আমি ভালোবাসার কাঙাল।

আমিও আমার বুকের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে তাকে সুখী করতে চেয়েছি। জানি না পেরেছি কি না। কিন্তু তার কাছ থেকে শান্তি পেয়েছি পূর্ণতা পেয়েছি। জীবন এতো সুন্দর হতে পারে সেটা তার ভালোবাসা পেয়ে বুঝলাম।

একদিন পিন্টু ভট্টাচার্যের গান শুনতে শুনতে সে বলেছিল *তুমি আমার নির্জন উপকূলের নায়িকা।*

এখন আমার চারদিক নির্জন, নির্জনতায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছে। সারা দিন মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলি।

তার মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো আমার কানে বাজে প্রতিটা মুহূর্ত। এখন আর ময়না বলে ডাক দিয়ে আমার নির্জনতা ভাঙে না কেউ।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

স্বপ্না

আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। একটি ছেলে প্রায় আমাকে বিরক্ত করতো। স্কুলে যাবার সময় রাস্তায় দাড়িয়ে থাকতো। আমার পেছন পেছন এসে বকবক করতো। কিন্তু কখনো আমি ওই ছেলেটির সঙ্গে একটি কথাও বলিনি। সে নিজের কথা নিজেই বলতো। বলতে গেলে তাকে সহ্য করতে পারতাম না। তাকে দেখলে ভয়ে আমার বুকটা কাপতো।

এর মাঝে আমার সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষা শুরু হলো। একদিন ভরদুপুরে নির্জন রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে ছেলেটি আমার পথ আটকায়। আমাকে তার প্রতি অনীহার হাজারো কারণ জিজ্ঞাসা করে যার একটি উত্তরও দিইনি। শেষ পর্যন্ত তাকে একটি শব্দ, শুধু না উচ্চারণ করে চলে এলাম।

তবুও তার কাছ থেকে রেহাই পাইনি আজ পর্যন্ত। সে তার সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আমাকে জয় করেছে। সে প্রমাণ করেছে আসলেই তার ভালোবাসা সব আমার জন্য। এভাবেই শুরুটা হলো। এবার বর্তমানটা বলি।

যাকে ভয় পেতাম, যাকে সহ্য করতে পারতাম না আজ সেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ। আর আমি আমার ভালোবাসার নাম রেখেছি স্বপ্ন। কারণ, সে আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। এটা অবশ্য ছদ্মনাম।

আমার স্বপ্নের মাঝে খুজে পাই জীবনের সবটুকু সুখ। যাকে ছাড়া বেচে থাকার কথা কল্পনাই করতে পারি না। আমি তাকে যতোটুকু ভালোবাসি তারচেয়েও দ্বিগুণ সে আমাকে ভালোবেসে।

আজ আমাদের ভালোবাসার সাত বছর পূর্ণ হলো। হাজারো কষ্ট, আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, নানান ঘাতপ্রতিঘাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকোচ, ভয়-ভীতি সব কিছু নিয়েই সাত বছর কাটলো।

আমাদের ভালোবাসাটা অনেকটা বাংলা সিনেমার মতো। ধনী-গরিবের ব্যবধান। আমার স্বপ্ন বড়লোক আর আমরা গরিব। এই নিয়ে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমার স্বপ্নের ভেতর কোনো বড়লোকত্ব নেই। কিন্তু তাদের পরিবার খুব সমস্যা করে। তবুও সব কিছুকে উপেক্ষা করে আমরা দুজন আমাদের ভালোবাসাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ভালোবাসা দিবস, জন্মদিন, নববর্ষ যেটাই আসুক, আমরা ঘুরতে যাই এখান থেকে সেখানে। অবশ্য সেটাও অনেক কষ্ট করে। যতো বাধা আসে ততোই আমাদের ভালোবাসা গভীর হয়। আমি ভেঙে পড়লেও আমার স্বপ্ন কখনো ভেঙে পড়ে না। বরং আমাকে আরো সাহসী করে তোলে।

আমার স্বপ্নকে কাছে পেলে আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছু ভুলে যাই। ভুলে যাই সব দুঃখ, যন্ত্রণা। সবচেয়ে বড় কথা সে আমাকে এতোই ভালোবাসে যার জন্য প্রতি মুহূর্তে তার কাছে হার মানছি।

সে খুব ভালো একটি ছেলে। একটি ছেলের মধ্যে যতোটুকু গুণ থাকা প্রয়োজন তার সবটুকু আছে। স্বপ্ন, আমার জন্য অনেক কিছু করেছে, করছে এবং করবেও। কিন্তু তাকে আমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিনি।

যতোদিন বাচবো তাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে যাবো। জীবন বিলিয়ে দেবো তার জন্য। তার ভালোবাসা আমাকে দিন দিন পাগল করে দিচ্ছে। তার পাশে গেলে এক আলাদা ভালোলাগা অনুভব করি। অনুভব করি তার কাছেই আমার ভালো লাগা, ভালোবাসা লুকিয়ে আছে।

নামহীন, চট্টগ্রাম থেকে

মনে রেখো

– সবুজ

কিছুদিন আগে মেট্রলিংক-এর বাসে চেপে নিউ মার্কেট থেকে মিরপুর যাচ্ছিলাম। আমার পাশেই বেশ সুন্দর করে দুটো মেয়ে বসেছিল। যে মেয়েটা একটু বেশি সুন্দরী তার হাতে একটা শাড়ির প্যাকেট ছিল। আমি দেখলাম, প্যাকেটে লেখা, *মনে রেখো শাড়ি বিতান।*

মেয়েটার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আমার চোখাচোখি হচ্ছিল। তবে আমার চেয়ে বোধহয় মেয়েটাই বেশি করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

শ্যামলী পৌছানোর পর মেয়ে দুটো নামার জন্য সিট থেকে উঠে দাড়ালো। আমি তাদের দিকে তাকালাম। হঠাৎ করেই শাড়ির প্যাকেট হাতে মেয়েটা প্যাকেটের *মনে রেখো* লেখাটার ওপর হাত দিয়ে আমাকে সেটা দেখালো এবং সুন্দর করে হেসে বাস থেকে নেমে গেল।

তার ওই সুন্দর হাসিতে আমার বুকে যেন শেল বিধলো। এরপর ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। কিন্তু ওই সুন্দর মুখটা ভুলতে পারিনি। মেয়েটার কথা মতোই তাকে মনে রেখেছি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

শামুক

– মুক্তা

আমি মুক্তা। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়পুরে অবস্থিত *কওমী জুট মিলস হাই স্কুল* থেকে আমার শিক্ষা জীবন শুরু। প্রতি বছর নতুন ক্লাসে ভর্তি, নতুন বই, কিছু কিছু মুখ কি সুন্দর ছিল দিনগুলো!

সময় পেরিয়ে বছর গড়িয়ে যেতে লাগলো। ক্লাস এইটে ওঠার পর রুম্পা নামের এক বান্ধবী আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে যায়। আমি হয়ে যাই একা। কিন্তু ফাকা স্থান বেশি দিন ফাকা থাকে না। আবার নতুন বান্ধবী, আবার পথ চলা।

এসএসসি পাস করে রাজশাহী চলে এলাম। ভর্তি হলাম রাজশাহী সিটি কলেজে। কাউকে চিনি না। দুরু দুরু করে বুক কাপতে লাগলো। কিছুটা আনন্দ, কিছুটা ভয় দিয়ে কলেজ জীবন শুরু।

পাকশি থেকে আসা টনি এবং বিহারি কলোনি থেকে আসা টফি নামের দুটো মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ যেমন–তেমন সম্পর্ক নয়, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক যা সহজে শেষ হয় না।

টফি নিজের বাড়ি ও টনি মামির বাসা এবং আমি খালার বাসা থেকে ক্লাস করতাম। সকাল সাতটা থেকে বিকাল পাচটা পর্যন্ত আমরা একত্রে থাকতাম। এক সঙ্গে প্রাইভেট পড়া, কনফেকশনারিতে খাওয়া, সাহেববাজার যাওয়া, ক্লাস ফাকি দিয়ে কমনরুমে গিয়ে আড্ডা দেয়া, প্র্যাকটিকাল শেষে হেলেদুলে বাড়ি ফেরা। এ যেন স্বপ্নের রাজ্যে বাস।

বেশ ভালোই ছিলাম তিন বান্ধবী। মাঝে মধ্যে আমার বেশ গর্ব বোধ হতো এই দু বান্ধবীকে নিয়ে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় টফি রেজাল্ট খারাপ করে। আমি ও টনি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করি। শুরু হয়ে যায় আমাদের দুজনের ভর্তি যুদ্ধ। আমি ভর্তি যুদ্ধে পরাজিত হলাম। টনি সিলেট শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে গণিত বিভাগে ভর্তি হয়। কিন্তু টনি–র প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়ার। তাই টনি সিলেট থেকে ফিরে আসে। আবার আমরা দুজন একত্রিত হলাম রাজশাহীতে।

টনি প্রায়ই আমাকে বলতো, মুক্তা, কফি হাউসে ঢুকবি না, আমি কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পেলে আমরা একত্রে কফি হাউসে ঢুকবো। পদ্মার পাড়ে ঘুরতে যাবি না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই, তারপর আমরা দুজনে এক সঙ্গে পদ্মার চরে ঘুরতে যাবো।

কেউ কি বিশ্বাস করবে রাজশাহীতে আজ চার বছর হলো আছি, অথচ পদ্মার পাড় কিংবা কফি হাউসে ঢুকিনি।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম। ইউনিভার্সিটিতে চান্স না পাওয়ায় আমার মনেও প্রচণ্ড কষ্ট ছিল। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর যখন দেখতে পেলাম চান্স পাইনি তখন আমার কি যে কষ্ট হচ্ছিল তা শুধু আমিই জানি।

কিন্তু আমার বাবা যখন মাথায় হাত রেখে বললেন, সবাই তো আর ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় না। তাই বলে তো পড়াশোনা বাদ দিয়ে কেউ বসে থাকে না।

বাবা আমাকে আরো বোঝালেন। কিন্তু টনির তো বাবা ছিল না। সিলেট ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস না করায় ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। টনি হয়ে যায় একা।

আত্মীয়স্বজনের গঞ্জনা, ভাই–ভাবীর তাচ্ছিল্য, মামা–মামির অবহেলা তাকে ঠেলে দেয় গভীর অন্ধকারে।

২০০৩ সালের মে মাসের ২৮ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়। সে আমাকে ২৯ তারিখ সকালে তাদের বাসায় যেতে বলে। আমি তাকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম সে যেন রেডি হয়ে থাকে।

টফির বাসায় দীর্ঘ দিন আমাদের যাওয়া হয় না। আমি ও টনি ২৯ তারিখে টফির বাসায় যাবো বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কি জানতাম এই আমাদের শেষ দেখা, শেষ কথা বলা, আর কোনোদিন আমি তাকে দেখতে পাবো না, কথা বলতে পারবো না।

এখনো বিশ্বাস করতে পারি না, যে মেয়ে ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যেতে পারে না, কালারফুল জামা পরতে ভয় পায়, সেই মেয়ে কি করে পারলো ফ্যানের সঙ্গে ওড়না ঝোলাতে! তার কি এতোটুকু মনে হলো না, তার মা আজও বেচে আছেন। বিদায়বেলায় তার কি মনে হলো না, তার বান্ধবী আছে?

বিশ্বাস করতে পারি না আমি একা, আমার পাশে কেউ নেই।

২৮ তারিখ রাতে প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছিল। আমি কি জানতাম, এ ঝড়েই আমার জীবনের চমৎকার দিনগুলা ধুয়ে মুছে যাবে?

আমার তো অন্য কোনো বান্ধবী ছিল না। ফলে কারো সঙ্গে কষ্ট শেয়ার করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আজ আমি মেসে থাকি। এ আমিই এক সময় ঘরে একা থাকতে ভয় পেতাম না। আজ রুমে কেউ না থাকলে অন্য রুমে ঘুমাতে যাই। যখন একা বসে থাকি তখন মনে হয় ওই বুঝি টনির কল এলো। আমাকে এখুনি বের হতে হবে। নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলে মনের মধ্যে ভয় জাগে, ওই মেয়েও বুঝি আমাকে কষ্ট দেবে।

আমি আর আগের মতো মিশতে পারি না। ধীরে ধীরে নিজেকে শামুকের মতো খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছি।

রাজশাহী থেকে

পরিচিত

– মোহাম্মদ নুরুল আমিন

ম্যাডাম সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন। তার মাত্র এক বছর আগে এখান থেকেই পাস করে বেরিয়েছেন। ম্যাডামকে প্রথম দিন ক্লাসে দেখেই অবাক হয়েছিলাম। বেশ সুন্দর! আশ্চর্য এক রূপ–লাবণ্য ছড়িয়েছিল পুরো ম্যাডাম জুড়ে।

তার চোখ দুটো ছিল যেন ছোট দুটো সাগর। ইচ্ছা করলেই ওই সাগরে ডুব দেয়া যায়। ঠোঁট দুটো ছিল বিশ্বজয়ী। তাই যখন হাসতেন তখন মনে হতো যেন মুক্তা লুটিয়ে পড়ছে। কণ্ঠস্বর ছিল সুর যন্ত্র। কথা বললে অমিয়ধারার মতো এসে কানে বাজতো।

ম্যাডাম তার চুলগুলো সব সময় বেধে রাখতেন। কিন্তু তার মধ্যে যে এক অপূর্ব দৃশ্য লুকিয়ে আছে তা দেখতে পেলাম একদিন। হঠাৎ চুলের বাধন খুলে গেল। যেন উচু পাহাড় থেকে ঝরনাধারা নেমে এলো। চেষ্টা করছেন বাধতে। কিন্তু অবাধ্য ঝরনা বাধ ভেঙে নেমে আসছে।

অপলক চোখে দেখছি অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য। শুধু ওই দিন নয়, প্রথম দিন থেকেই ম্যাডামকে দেখতাম অপলক চোখে।

বন্ধুরা আমাকে ক্ষেপাতে শুরু করলো। ভালো লাগা বেড়ে গেল। মনে হলো যেন শুধু আমার ছোট্ট বাগানের শোভা বর্ধনের জন্যই এই ফুলটির জন্ম। অন্য কেউ ম্যাডামকে নিয়ে কিছু বললে মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। মাঝে মধ্যে নানান অজুহাতে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতাম।

একদিন কোনো কথার ওপরেই ম্যাডাম রেগে গিয়ে বললেন, তুমি প্রথম দিন থেকেই আমাকে ডিস্টার্ব করছো। কি যে বলো বুঝি না।

ডিস্টার্বটি হলো, প্রথম মুহূর্ত থেকেই অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছি ওই চাদমুখের দিকে। ডিস্টার্ব থেকে ম্যাডামকে মুক্তি দিতে তার ক্লাসে যাওয়া বাদ দিয়ে দিলাম। প্রিয়াকে দেখা থেকে নিজেকে নিরস্ত রাখলাম অতিকষ্টে।

কিছুদিন পরে শুনি ম্যাডাম চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

আমাদের ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তনের দিন বিকেলে গেট দিয়ে বের হচ্ছিলাম। ম্যাডামকে দেখলাম তার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে। আমি যেন ওজন শূন্য হয়ে গেলাম। কোনো রকমে রাস্তা পার হলাম। কথা বলার প্রবল ইচ্ছা হলো। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, ম্যাডাম রিকশায় আসছেন।

ইশারা করতেই ম্যাডাম বললেন,

তুমি কেমন আছো?

ভালো।

আমার উপরে কি তোমার এখনো রাগ আছে?

না ম্যাডাম, রাগ থাকবে কেন? এখন কোথায় চাকরি করেন।

কোথাও না। শিরোইলে শ্বশুরবাড়িতে আছি।

বিয়ে হয়ে গেছে কবে?

কিছুদিন আগে।

আর কিছু না বলেই ম্যাডাম রিকশাচালককে এগিয়ে যেতে বললেন।

পাথর হয়ে দাড়িয়ে আছি, দেখছি আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যাওয়া রিকশাটাকে। দেখছি আস্তে আস্তে দৃষ্টির বাইরে যাওয়া রিকশার ভেতরের মানুষটাকে। এই ম্যাডাম যেন আমার আরো বেশি পরিচিত।

রাজশাহী থেকে

পুতুল

– মোহাম্মদ সিয়াম সারোয়ার জামিল

আমার জীবনে একটি মাত্র প্রেম। সে প্রেমের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এই তো ২০০০ সালের জানুয়ারি মাস। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি।

ক্লাসের দ্বিতীয় দিন আমাদের ক্লাসে একটি মেয়ে ভর্তি হলো। আসতে আসতে সব পরিচয় জানলাম। মেলামেশা শুরু হলো। বুঝতে পারলাম না কখন যে তাকে ভালোবেসে ফেললাম। একটা সময় এলো তাকে আমার মনের কথা বললাম।

সেও আমার কথায় সাড়া দিল। বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তখন মনের ভেতরটা জুড়িয়ে গেল। এভাবে কাটলো অনেক দিন।

এক সময় এলো আমার জন্মদিন। মনে মনে ভাবলাম নিমন্ত্রণ দেবো। দিলাম।

সে জন্মদিনের দিন কয়েকটি রজনীগন্ধা ও তার মাঝে একটি গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো একটি ফুলের তোড়া এবং একটি বই উপহার দিল। সে বললো, *হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।*

পরে আমি বইটি দেখলাম উপন্যাসের বই।

বইটিতে লেখা, *আমি চেয়েছিলাম শুধু তোমাকেই।*

সেদিন আমার জীবনে একটি উপন্যাসের বই সেই প্রথম উপহার।

কিছুদিন পর তার বাবা বদলি হয়ে চলে যাবেন বগুড়া। এমন সময় স্কুলে তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। বললো, আমি ও আমার পরিবার বগুড়া চলে যাচ্ছি।

কেন?

আমার বাবা বদলি হয়ে গেছে।

কথাটি শোনার পর উভয়ের চোখে অশ্রু এলো।

তারপর সে ব্যাগ থেকে একটা কনে পুতুল বের করে বললো, এটা তোমার কাছে রাখো। এই পুতুল দেখলে আমার কথা তোমার মনে পড়বে।

আমি তখন কি করবো বুঝে পাচ্ছি না। তারপর দৌড়ি গিয়ে পাশের দোকান থেকে কিনে আনলাম একটা বর পুতুল। সেটা তাকে উপহার দিলাম। বললাম, এই পুতুলটি তোমার কাছে রাখলে আমার কথাও তোমার মনে পড়বে।

খুশিতে কাদতে লাগলো সে। সে পুতুলটি ব্যাগে ভরলো। বললো, আল্লাহ হাফেজ।

তারপর সে চলে গেল।

চরজোতপ্রতাপ, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

টুয়েলফথ ম্যান

– হেমায়েত হোসেন হিমু

ক্ষুদ্র এই জীবনে যে খেলায় সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছি তার নাম কৃকেট। প্রচণ্ড ভালোবাসা আর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এই খেলায় পারদর্শী ছিলাম না কোনোকালেও।

তবে পকেটের টাকা দিয়ে আমাদের পাড়ার কৃকেট দলে টুয়েলফথ ম্যান বা দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে নাম লিখিয়েছি বেশ কয়েকবার। এক্ষেত্রে আমাকে শর্ত দেয়া হতো যে দলের সকলের নাশতাসহ রিকশা ভাড়া আমাকে দিতে হবে।

এখন কর্মজীবনে বারো ঘণ্টা ডিউটির পর যেটুকু সময় পাই সেটাও ব্যয় করি ক্রিকেটের পেছনে। আবাসিক কোয়ার্টারের সিড়ির পাশে টিউব লাইটে চলে আমাদের ডে-নাইট ম্যাচ। কৃকেট শুধু এখানেই শেষ নয়, আমার প্রেমের ভুবনেও ফেলেছে তার শক্ত প্রভাব।

মিলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনই তাকে আমার মনে ওয়ানডে খেলার স্টেটাস দিয়েছিলাম। কারণ, যাযাদির মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলাম, মামাতো বোনদের মনে নাকি ফুপাতো ভাইদের জন্য ত্রিশ ভাগ জায়গা অগ্রিম বুকিং থাকে। আশা করেছিলাম তার মনে ওপেনিং ব্যাট করবো, হবো অলরাউন্ডার আবদুর রাজ্জাক।

তাকে আমার ভালোলাগার কথা জানাতেই বললো, তোমার মতো অনেক খেলোয়াড় পেছনের সিরিয়ালে আছে।

বললাম, আমি যেহেতু ফুপাতো ভাই সেহেতু স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেবো।

সে উত্তর দিল, তাহলে টুয়েলফথ ম্যান হিসেবে থাকো।

সেদিনই প্রথম জানতে পারলাম সুন্দরী মেয়েদের প্রেমের খেলায় খেলোয়াড়দের তালিকা কতো বড় থাকে।

মনকে সান্ত্বনা দিলাম এটা ভেবে যে, যাক, অন্তত টুয়েলফথ ম্যান হিসেবে তো দলে আছি। এক্ষেত্রে রাজিন সালেহ আমার মনে অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রথম টেস্টে টুয়েলফথ ম্যান হয়েও শচিনের দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে যে চমক দেখিয়েছিল, আমার মনেও সেই আশা। ভালোবাসায় চমক দেখিয়ে আপন করে নেবো।

মনে বড় চমকের আশা নিয়ে ভ্যালেনটাইনস ডে, ঈদ এবং তার জন্মদিনে নতুন বছরের শুভেচ্ছা স্বরূপ উপহার পাঠাই।

কিন্তু আমার চমকগুলো মলিন হয়ে যায় বেস্ট ইলেভেনের দামি দামি সব উপহারের কাছে।

এখন মনে সান্ত্বনা একটাই। কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে যখন সম্পর্কের টান পড়ে তখন অন্তত দলে ডাক পাই।

মনে মনে ভাবি, টাকা নামের প্রতিভা যদি থাকতো তাহলে নিশ্চিত ওপেনিং ব্যাট করতাম।

আমার কোচ পরামর্শ দেন মিলার দলে খেলার আশা বাদ দিতে। কিন্তু টুয়েলফথ ম্যানই বা কম কিসে!

মাঝে মধ্যে ভাবি, মিলার মনটা আইসিসি-র মতো উদার হতো! আইসিসি যেমন বাংলাদেশে কৃকেট জনপ্রিয়তা আর সম্ভাবনার কথা ভেবে টেস্ট টেস্টাস দিয়েছে। তেমনি মিলাও যদি আমার ভালোবাসার গভীরতা এবং একাগ্রতা দেখে আমাকে দলের এক নাম্বারে রাখতো তবে কতোই না ভালো ব্যাট করতাম!

দেশে এতো ট্রেনিং শিবির হয়, আমার জন্য কি কিছু করা যায় না? দয়া করে কিছু একটা করুন। কারণ, টুয়েলফথ ম্যানের জীবনটা খুব কষ্টের।

পাংশা, রাজবাড়ী থেকে

পদের ভালোবাসা

– মোশাররফ

১. প্রথমেই দেশবাসীর ভালোবাসা যা একটু অন্য রকম। ১৯৯১-এ খালেদাকে ভালোবেসে প্রতারিত হয়। তারপর ১৯৯৬-এ হাসিনাকে ভালোবেসে প্রতারিত হয়। আবার ২০০১-এ খালেদাকে এবং যথারীতি প্রতারিত। আমি নিশ্চিত, জনগণ আরেকবার ২০০৬-এ প্রতারিত হবে হাসিনাকে ভালোবেসে। অর্থাৎ জনগণের ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং প্রতারিত হওয়া সমার্থক।

২. ক্ষমতায় থাকলে খালেদা ভালোবাসেন শিফন শাড়ি ও উন্নয়নের জোয়ারকে। ক্ষমতায় না থাকলে রাজপথ ও হরতালকে।

৩. ক্ষমতায় না থাকলে হাসিনা ভালোবাসেন ওয়াদা ভঙ্গ, হরতাল ও বিদেশ সফর। ক্ষমতায় থাকলে (বঙ্গবন্ধুর) স্বপ্ন! ও ডিগ্রি নিতে।

৪. সাইফুর নতুন নতুন করারোপ করতে। প্রেমিক-প্রেমিকারা তাই সাবধান আগামী বাজেটে ট্যাক্স বসবে আপনাদের ওপর।

৫. এরশাদ ক্ষমতার স্বপ্ন ও বিদিশাকে।

৬. নিজামী আচলাচ্ছাদিত ক্ষমতাকে।

৭. মন্ত্রীরা বিটিভিতে তাদের মুখ দেখাতে।

৮. পুলিশ ঘুসকে।

৯. বুশ যুদ্ধ করতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

১০. শ্যারন প্যালেস্টাইনিদের হত্যা করতে।

১১. তসলিমা বিতর্কে জড়াতে।

১২. বিটিভি সরকারের প্রপ্রগান্ডা করতে।

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর থেকে

ছিনতাই

–নজরুল ইসলাম (বাবা)

গুনগুনিয়ে গান গেয়ে বাড়ি ফিরছি আর বার বার পকেটে হাত রেখে দেখছি টাকাগুলো ঠিকমতো আছে কি না। না ঠিকই আছে। আজ তিন মাস পর বিল পেলাম। একটি কম্পানিতে কমপিউটার অপারেটর পদে কাজ করি। চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ। কাজ অনুযায়ী পয়সা। তবুও ঠিক মতো বিল পাই না। তিন মাস পরে প্রথম টাকা পেলাম। তাই মনটা খুবই আনন্দে আছে।

রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে ভাবছি সাথীর কথা। এ টাকাগুলো পুরোটাই তার হাতে তুলে দেবো, খুব খুশি হবে সে। বাড়ির সবার মতামতকে অগ্রাহ্য করে আমরা বিয়ে করেছি। তাই বাড়িতে জায়গা পেলেও খাবার বন্ধ। গত তিন চার মাস খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। ভাড়ার অভাবে হেটে অফিসে এসেছি ও বাড়ি ফিরেছি। ক্লান্ত দেহে প্রাণ এসেছে তার সেবায়। আমরা কোনোদিন খেয়ে, না খেয়ে থেকেছি। তবুও পিতৃদেবের কাছ থেকে কিছুই চাইনি। সে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চালিয়ে গেছে। একজন পারফেক্ট বাঙালি নারীর ছবি দেখেছি তার মধ্যে।

ভাবছি টাকাগুলো দিয়ে তাকে একটা শাড়ি কিনে দেবো। প্রথম উপার্জনের প্রথম উপহার। তার মলিন মুখের দিকে তাকালে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিছুই দিতে পারিনি তাকে। শাড়ি পেয়ে হয়তো সে কপট রাগ করবে আমার সঙ্গে।

এসব আনতে গেলে কেন?

বারে, তোমাকে বুঝি কিছুই দিতে মন চায় না আমার!

তাই বলে এতো দামি শাড়ি?

দামটাই দেখলে? ভালোবাসাটা দেখলে না।

ওটা দেখেছি তোমার চোখে।

আমি যে তোমাকে খুব ভালোবাসি সাথী।

তোমাকেও খুব ভালোবাসি। বলে হয়তো আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়বে।

মনে মনে হাসলাম। রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে আনমনে কি ভাবছি আমি। শাড়ি কেনার পর বাকি টাকাগুলো দিয়ে কিছু জমা রাখবো তার কাছে যাতে প্রয়োজনে খরচ করা যায়। আবার কবে বিল পাই? হেটেই অফিসে যাবো আর আসবো। অভ্যাস হয়ে গেছে। হাটতে হাটতে ভাবি, বেড়াতে গেলে কেমন হয়? তাকে অবাক করে দিয়ে বলবো, চলো কক্সবাজার থেকে ঘুরে আসি।

টাকা পাবে কোথায়? অবাক হয়ে বলবে সে।

টাকার চিন্তা নেই। সে আমি বুঝবো।

কিন্তু মেলা টাকা খরচ হবে না।

হোক। তোমার ইচ্ছা ছিল সমুদ্র দেখার। চলো সেই সাধ পূরণ করে দিই।

আমাকে নিয়ে এতো ভাবো কেন?

কারণ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। অকারণে হয়তো হেসে উঠবে সে।

আমিও হেসে উঠলাম।

হঠাৎ দেখি রাস্তার লোকজন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি মাথা নিচু করে দ্রুত হেটে চললাম। কি ভাবছি আজ? আজ ভালোবাসা বেড়ে গেছে। কারণ কি? টাকা? টাকা কি ভালোবাসা বাড়ায়?

গলির মোড়ে পৌছালাম। ওই তো সামনে বাড়ি দেখা যায়। সাথী হয়তো প্রতিদিনের মতো আজও আমার অপেক্ষায় আছে। রুমে বাতি জ্বলছে। নির্জন রাস্তা।

হঠাৎ যমদূতের মতো কয়েকজনের আগমন।

কিছু বুঝে ওঠার আগে সব হারালাম। রক্তাক্ত ঠোট এবং ফুলে ওঠা গাল দিয়ে বাড়ির দিকে তাকালাম। সাথী এখনো অপেক্ষায়। একটু আগের মুহূর্তের আনন্দ আর নেই। আনন্দ ছিনতাই হয়ে গেছে। ভালোবাসাও কি? স্বপ্নগুলো ভেঙে যায়। অপূর্ণ রয়ে গেল সমুদ্র দেখার সাধ। তবুও বাড়ির দিকে হাটলাম।

এবার কোনো স্বপ্ন নেই।

গৌরনদী, বরিশাল থেকে

প্রথম সেই দিন

–রেখা

২০০১ সাল। তখন যৌবনকাল। সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। সমস্ত মন জুড়ে এক অদ্ভুত আনন্দ খেলা করছিল। এমনই এক সময় প্রায় পাচশ মাইল দূর থেকে আসা একটি চিঠি যেন তাকে আরো দ্বিগুণ করে দিল।

একে তো নাচুনে বুড়ি, তার উপর যেন ঢোলে বাড়ি।

চিঠিটি দিয়েছে আমার এক মামাতো ভাই যাকে দেখলে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হতাম। কিন্তু নিয়তির কি খেলা সেই মানুষটিই আজ আমার সবচেয়ে পছন্দের মানুষ।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক ছিল আশা–নিরাশার মধ্যবিত্ত স্থানে। তার সঙ্গে আমার দেখা হতো বছরে চার পাচবার। বছরের বাকি দিনগুলো নির্ভর করতাম চিঠি এবং আধুনিককালের যোগাযোগের অন্যতম হাতিয়ার মোবাইলের ওপর। দোটানার মাঝে পড়ে আমাদের সম্পর্কের অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়।

প্রথম যখন এই ভালোবাসার বীজ ফুটি ফুটি করছে তখন একদিন সে আমাকে স্থানীয় কোনো এক ফাস্ট ফুডের দোকানে দেখা করতে বলে।

আমরা সেখানে উপস্থিত হই। নানান কথার মাঝে হঠাৎ সে আমার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে মারে, আচ্ছা বলো তো, আমাকে তোমার কেমন লাগে।

বললাম, হ্যা, ভালো।

কেমন ভালো?

ভালো, খুব ভালো?

আবার জিজ্ঞাসা করে, আমাকে ভালোবাসো?

এখন কি বলবো? তাই চুপ করে থাকি।

তৎক্ষণাৎ সে আমার হাত ধরে খুবই হালকাভাবে।

হঠাৎ মনে হলো ভুল করে বোধহয় একটি ট্রেন ঢুকে পড়েছে আমার বুকের ভেতর। সমস্ত শরীর যেন নিমেষেই দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো।

আবার বললো, চুপ করে আছো কেন? ভালোবাসো?

আমি মাথা নাড়াতেই সে আমার হাতটি একটু শক্ত করে ধরলো।

এখন আমি আরো জোরে কাপতে থাকি। বুকের ভেতর থেকে কলিজাটা যেন যে কোনো মুহূর্তেই বাইরে বেরিয়ে আসবে। মনে হলো যেন কালবৈশাখির ঝড় শুরু হয়ে গেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা এ ঝড় চলতে থাকে।

যখন বাসায় আসি তখন কেমন যেন লজ্জা লাগতে থাকলো।
এক সময় সে আমার ঘরে এসে এক চড় মেরে বসলো আমার গালে।
আমি আকাশ থেকে পড়বো কি? পুরো আকাশটাই যেন মুহূর্তের মাঝে আমার মাথায় ভেঙে পড়লো।
কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় ডজন খানেক চুমু দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বের হয়ে যায়।
এরপর এসে জানতে চায় রাগ করেছি কি না।
সত্যি কথা বলতে কি, এটা ছিল তার চুমু দেয়ার একমাত্র কৌশল। এখনো যদি সে আমাকে চড় দেয় তাহলেই বুঝে ফেলি এরপর কি ঘটবে, মনকে বলি। ধৈর্য ধরো, *সবুরে মেওয়া ফলে*।
বর্তমানে সে একজন ডাক্তার। ভালোবাসাবাসির কোনো সময় তার হাতে নেই। তাই তো মাঝে মধ্যে মনে হয়, হায়! জীবনের প্রতিটি দিন কেন ভালোবাসার সেই প্রথম দিনের মতো হয় না?

কাপাসগোলা, চট্টগ্রাম থেকে

অ্যালবাম

–আকাশ

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। ইউনিভার্সিটিতে তখন ভর্তি পরীক্ষা চলছে। আমরা কয়েক বন্ধু তখন *মেহেরচণ্ডি ফালগুনী* ছাত্রাবাসে থাকি। ঠিক সেই সময় আমার নিজ গ্রাম থেকে এক চাচা তার মেয়েকে নিয়ে একদিন আমাদের ছাত্রাবাসে এলেন।
চাচা আমাদের বললেন পিচ্চি ভর্তি পরীক্ষা দেবে। এ জন্য পিচ্চিকে বেশ কয়েকদিন ইউনিভার্সিটিতে থাকতে হবে।
পিচ্চি হলো চাচার মেয়ের নাম। তাই বাড়িতে কাজ থাকায় চাচা তো থাকতে পারবেন না আমাদেরকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। পিচ্চিকে আমি ও আমার খুব কাছের বন্ধু লিটন রোকেয়া হলে থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। চাচা তার পরের দিন বাড়িতে চলে গেলেন। আমরা দুজন দায়িত্ব নিলাম সত্যি। কিন্তু দায়িত্ব আর পালন করি না। তার মানে কোনোদিন পশ্চিমপাড়ায় গিয়ে চাচার মেয়ের কোনো খোজখবর নিই না। তাই তিন দিন পরে পিচ্চি ও তার এক ইয়া মোটা নববান্ধবীকে নিয়ে বেলা তিনটার সময় ছাত্রাবাসে হাজির। পিচ্চি আমাদের দুজনকে পেয়ে যা বলার বললো রাগ করে। যেমন, আমরা হলাম ঘরকুণো ব্যাঙ, ঘর ছাড়া কিছু বুঝি না ইত্যাদি।
আমরা তাদের রাগ থামালাম। শেষে বললাম, এবার আর আমাদের ভুল হবে না। এবার প্রতিদিন বিকেল বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা করবো। এই বলে তাদের দুজনকে রোকেয়া হলে পৌছে দিলাম।
তার পরদিন বিকাল চারটায় গিয়ে পিচ্চিকে কল দিলাম।
পিচ্চি আবার তার নববান্ধবীকে নিয়ে বের হলো। পিচ্চি তার নববান্ধবীকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তার ভাবী এবং রসায়ন বিভাগে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী বলে।
নববান্ধবীর নাম হলো গেদি। তারপর আমি আকাশ গেদির সঙ্গে গল্প করি আর হাটি এবং আমার বন্ধু পিচ্চির সঙ্গে। এভাবে তিন চার দিন কাটলো।
এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। তাই আমাদের প্রস্তুতি সকাল থেকে শুরু হলো। সকালবেলায় উঠে শেভ করা, জামা-কাপড় পরিষ্কার, ইস্ত্রি ইত্যাদি। আমাদের পরিকল্পনা বেলা চারটার সময় রোকেয়া হলে কল দিয়ে পিচ্চি আর গেদিকে নিয়ে ঘুরবো।

কিন্তু পিঙ্কি গেদি আমাদের চেয়েও মনে হয় এক ডিগ্রি উপরে। তাই বেলা আড়াইটায় আমাদের মেসে এসে হাজির।

কি আর করা! আমরা দুবন্ধু ও তিন বন্ধু মোট পাচ বন্ধু এবং পিঙ্কি ও গেদি ক্যাম্পাসে ঘুরতে বের হলাম। ঘুরতে ঘুরতে যখন রোকেয়া হলের গেটে এলাম তখন বেলা পাচটা বাজে।

এখানে বলে রাখা ভালো, পিঙ্কি বেশ লম্বা ফিগারের একটি মেয়ে, গায়ের রঙ শ্যামলা। চেহারায় বেশ আকর্ষণীয় একটি ভাব আছে। এবং গেদির গায়ের রঙ পরিষ্কার। কিন্তু একটু মোটা। তাতে কি, চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয় ও সেক্সি।

তখন গেদি আর পিঙ্কি বললো, ভাইয়ারা, আপনারা একটু দাড়ান, আমরা হলের ভেতর থেকে একটু কাজ সেরে আসছি।

ওদের অপেক্ষায় আমরা হলের গেটে দাড়িয়ে অন্য মেয়ে দেখছিলাম আর আড্ডা দিচ্ছিলাম।

ঠিক দশ পনেরো মিনিট পরে ওরা বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসার পরেই গেদি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো ভাইয়া আপনি আমার সঙ্গে একটু চলেন তো। এই বলে গেদি একটি রিকশা ঠিক করে উঠে পড়লো।

আমি তার পাশে উঠতে না চাইলেও বন্ধুরা আমাকে জোর করে উঠিয়ে দিল।

বন্ধুদের কাজ হলো নিজের জন্য কিছু হোক বা না হোক, অন্যদের সহযোগিতা করা। তাদের দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করলো।

রিকশায় উঠে তার পাশে বসতেই তার গায়ের মিষ্টি সুবাস পেলাম, যা আমার মনকে ভরিয়ে দিল। রিকশায় ওঠার পর গেদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

আমি মনে করলাম ক্যাম্পাসের ভেতর কোথাও হয় তো যাবে। কিন্তু না।

সে বললো শহরে যাবো। গত দুইদিন আগে শহর থেকে একটি ঘড়ি কিনেছে। কিন্তু ঘড়িটি এখন শুধু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই ঘড়িটি চেঞ্জ করার জন্য যাচ্ছি।

তাকে বললাম, এখন বাজে প্রায় সাড়ে পাচটা। শহর থেকে আসতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তখন তো তোমার হলে প্রবেশ বেশ সমস্যা হবে।

গেদি বললো, কোনো সমস্যা হবে না। আপনি লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে থাকুন।

থাকলাম বসে। কি আর করা, যুবতী মেয়ের আদেশ। না শুনে কি পারা যায়!

যাবার সময় হালকা-পাতলা আরো কিছু কথা হলো।

সে বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল সারা দেশব্যাপী হরতাল। যখন আমাদের রিকশা রাজশাহী শহরে জিরো পয়েন্টে পৌছালো তখন দেখলাম খুব বড় একটি বিএনপির মিছিল আসছে, তার পেছনে আসছে পুলিশ। হঠাৎ করে পুলিশের সঙ্গে মিছিলের লোকদের পিকেটিং শুরু হয়ে গেল।

আমরা দুজন গেলাম ভয় পেয়ে। রিকশাচালককে বললাম, ভাই, তাড়াতাড়ি রিকশা একটু নিরাপদে নিয়ে চলেন।

রিকশা ঘোরাতেই বড় একটি ইটের টুকরা আমাদের রিকশাকে আঘাত করলো। আমরা দুজন আরো ভয় পেয়ে গেলাম। ভুলে গেলাম আমার পাশে অবলা যুবতী মেয়ে বসে আছে। তাই রাস্তার পাশে একটি বেকারির দোকান পেয়ে আমি আগে ঢুকে পড়লাম। বেকারির দোকানের ভেতর প্রায় চোদ্দ পনেরো জন লোক ছিল। তারা তখন দোকানের ঝাপ ফেলে দিচ্ছিল। কিন্তু আমাদের দেখে ঝাপ একটু ফাকা রাখলো।

গেদি নামলো দোকানে ঢোকার জন্য। রিকশা থেকে গেদি নামতেই আরো একটি ইটের টুকরা তার পায়ের কাছে এসে পড়লো। সে তখন চিৎকার করে দোকানের ভেতর প্রবেশ করেই লোকজনের সামনে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো যে, তখন তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারিনি।

লোকজন তখন বাইরের পিকেটিং বাদ দিয়ে আমাদের দুজনকে দেখছে। আর আমি খেয়াল করছি, লোকজন কিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রায় পাচ সাত মিনিট পর সে আমাকে ছাড়লো।

আমাকে ছেড়েই বললো, আপনি যতোক্ষণ আমার সাথে আছেন প্লিজ আমার হাত দুটি ছাড়বেন না।

তারপর তার হাত দুটি ধরে দোকানে গিয়ে ঘড়ি চেঞ্জ করে ফিরছিলাম। রিকশায় যখন ফিরছিলাম তখনো তার দুটি হাত আমার হাতের মধ্যে ছিল। তাকে বলেছিলাম, তোমার হাত এতো গরম?

ঠিক এভাবে যখন রোকেয়া হলের গেটে পৌছালাম তখন দেখলাম বন্ধুরা আমার ও গেদির জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর তাকে বিদায় দিয়ে আমরা চলে এলাম। আসার সময় ধন্যবাদ দিলাম বিএনপি সমর্থিত হরতালকে। যা এমন একটি দিনে আমার জীবনে এমন একটি স্মৃতি অংকন করে দিয়েছে তা কোনো দিন ভোলার নয়।

তাই তো প্রতি ১৪ ফেব্রুয়ারি এলেই মনে পড়ে তার কথা, মনে পড়ে তার বুকের উষ্ণতার কথা, তার হাতের উষ্ণতার কথা।

রাজশাহী থেকে

প্রশ্নপত্র

–এম. এমরোজ হাসান জয়

যায়যায়দিন ভালোবাসা দিবসের বিশেষ সংখ্যা

নির্বাচনী পরীক্ষা ২০০৪ইং

বিষয় : প্রেম শিক্ষা (প্রথম পত্র)

সকল শ্রেণী (সকল বিভাগের জন্য)

সময় : সাত দিন, **পূর্ণমান :** ১০০

১। এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর দাও যে কোনো পচিশটি। ২৫×২=৫০

ক. প্রেম কি?

খ. প্রেমের রঙ কি?

গ. প্রেমের গতিবেগ সেকেন্ডে কতো?

ঘ. প্রেমের ধর্ম কি?

ঙ. প্রেমের স্বরূপ কি?

চ. প্রেমের সূত্রটি লেখ?

ছ. প্রেম কেন করতে হয়?

জ. প্রেম কেন অন্ধ?

ঝ. প্রেমের উৎপত্তি কোথা থেকে?

ঞ. প্রেম কতো সালে কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন?

ট. প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি লেখ?

ঠ. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কে কে প্রেমে পড়েন?

ড. ভালোবাসা বলতে কি বোঝো?

ঢ. ভালোবাসা কি দিয়ে অনুভব করা যায়?

ণ. আমি তোমাকে ভালোবাসি একথা সর্বপ্রথম কে বলেছিলেন?

ত. ভালোবাসার পরিসীমা লেখ?

থ. ভালোবাসা দিয়ে পাচটি বাক্য রচনা লেখ।

দ. ভালোবাসা টক, ঝাল, মিষ্টি আসলে কি?

ধ. ভালোবাসা দিবস কোনটি, কতো সালে সেই প্রথা চালু হয়?

ন. ভালোবাসা দিবস বলতে কি বোঝো?

প. সেন্ট ভ্যালেনটাইন কে? তিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

ফ. যায়যায়দিন কতো সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে-র ডাক দিয়েছিল?

ব. ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে যায়ায়দিন প্রথম কবে লেখা আহ্বান করে?

ভ. ২০০৩ সালের ভালোবাসা দিবসের স্লোগান কি?

ম. ভালোবাসার শেষ ফল কি?

য. ভালোবাসার আলোচ্য বিষয় কি?

র. আমি তোমাকে ভালোবাসি কেন?

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৭×৩=২১

ক. প্রেমের সংজ্ঞা দাও। প্রেমের আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো?

খ. বাংলাদেশের প্রেমের গুরুত্ব কতোটুকু তোমার নিজের ভাষায় লেখ?

গ. *প্রেমের নাম বেদনা সে কথা বুঝিনি আগে* এ কথা সম্পর্কে তোমার মতামত বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করো?

ঘ. লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট এই প্রেমিক যুগলদের সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও যে কোনো তিনটি। ৩×২=৬

ক. ভালোবাসা এই চারটি অক্ষরের বিশ্লেষণ লেখ?

খ. ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস হলো কেন?

গ. যাদের ভালোবাসার মানুষ নেই তারা ভালোবাসা দিবসে কি করবে?

ঘ. ও প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি কোথায়?

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা লেখ। ৪×২=৮

ক. বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

খ. সব সুন্দর যদি সুন্দরী হতো তাহলে সুন্দরী দিয়ে পৃথিবীটা ভরে যেতো।

৫। নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলোর অর্থ লেখ। ৬×১=৬

(i) আই লাভ ইউ (ii) আই লাভ ইউ সো মাচ (iii) আই অলসো লাভ ইউ (iv) আই লাভ ইউ সুইটহার্ট (v) লাভ ইজ হেভেন অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ইউ (vi) লাভ ইজ পাওয়ার।

৬। তুমি কি কাউকে ভালোবাসো? তাহলে আজই তোমার ভালোবাসার গল্প আঠারোশ শব্দে লেখ। ৫

৭। তুমি কি প্রেম করে ছ্যাক খেয়েছো? ছ্যাক খেলে আজই ছ্যাক খাওয়ার ঘটনা লেখ। ৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রেম শিক্ষা বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন পত্রের জন্য অপেক্ষা করো। প্রকাশ পেতে পারে যে কোনো সংখ্যায়।

পরীক্ষার্থীদের জন্য শর্তগুলো :

১। অসদুপায় অবলম্বন, যেমন অন্য কারো সহযোগিতা নেয়া যাবে না।

২। সকল প্রেমিক+প্রেমিকারা অংশগ্রহণ করতে পারবে। যারা প্রেম করে তারা ছাড়া অন্য কারো উত্তর গ্রহণ করা হবে না।

৩। তোমাদের পরীক্ষার খাতা দেখবেন লাভ টিচার। নাম অজানা থাক।

কারাই, জয়পুরহাট থেকে

গার্লফ্রেন্ড

মেয়ে হিসেবে ফোর ফিফটি নাইন একেবারে খারাপ নয়। দীর্ঘ তিন বছর আমি পড়িয়েছি। দেখতে অনেকটা নায়িকাদের মতো। তবে বাংলার নায়িকাদের মতো একটু মোটা। দীর্ঘ দিন থেকে একটা বিষয়ে অফার দেবো বলে শুধু বলি আর ফোর ফিফটি নাইনও অফারটা শোনার জন্য ব্যাকুল।

আমাকে একদিন এমন করে ধরলো যে, অফারটা কি তা জানাতেই হবে।

বাধ্য হয়ে তাকে বললাম, তার জন্মদিনে অফারটা বলে দেবো।

ঠিক জন্মদিনের আগের দিন বললাম, তুমি আমাকে কি হিসেবে দেখো, বন্ধু, স্যার, অন্যান্য?

টিক মার্ক দিতে বলার পর তার থেকে জবাব এলো, আপনি যেটা বেশি পছন্দ করেন ঠিক তাই।

এমনি করে মিশু আমার গার্লফ্রেন্ড হয়। কথা ছিল শুধু আমরা দুজনই এ বিষয় জানবো, অন্য কেউ নয়। কিন্তু ফোর ফিফটি নাইন তার বান্ধবীদের কাছে বলে দিয়েছে। আমি এখন যায়যায়দিনের কাছে বলছি।

কথা দিয়েছিলাম ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। দেয়ার মতো সামর্থ থাকলে দিতে হবে এবং দেবো।

এক. ঠোটে চুমু দেয়া। রাজি হয়েছে। কিন্তু একেবারে কৃপণভাবে।

দুই. গালে ও কপালে। রাজি হলো।

এভাবে *তিন, চার, পাচ, ছয়, সাত।* তবে তিন নাম্বার-এ আসার পর সে তার বান্ধবীদের কথায় আর রাজি হয় না। পরে আমি শর্ত ভঙ্গ করে তিন, চার, পাচ-এর আংশিক সম্পন্ন করি, আদৌ ছয়, সাত সম্পন্ন করতে পারিনি। এখন সম্ভব নয়।

459-এর বান্ধবীগুলো ছিল অকালপক্ক। তার মধ্যে টেং টেং-এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কিন্তু বাকিগুলোর সঙ্গে দেখা হয়নি। টেং টেং সুন্দরী ও হিংসুটে। সুন্দরী মেয়েরা যা হয়! সে নাকি তিনজন ছেলেকে নাচাচ্ছে। আমার 459-ও এভাবে কয়েকজনকে নাচাচ্ছে। তাদের মৌসুমী নামের মৌ নাকি একটু জেদি, আমাকে হুমকি দিয়েছে। সে নাকি ছ্যাকা পার্টি।

গার্লফ্রেন্ড প্রথমে আমার খুব ভক্ত ছিল এবং আমার প্রতি খুব টান ছিল। কিন্তু শেষের দিকে সে একটু অন্য রকম হয়ে গেল। এক পর্যায়ে আমার সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক সব মুছে ফেলতে চায়। যদিও আমি তার স্বার্থে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছি তবুও আজ ভালোবাসা দিবসে যায়যায়দিন পত্রিকার মধ্যে জানাতে চাই, আমি আজও তোমার বন্ধু এবং বন্ধু। আজ ভালোবাসা দিবসে তোমাকে এবং তোমার বান্ধবীদেরকে অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা দিলাম।

বন্ধু **নতুন চাদ** , *উত্তরা, ঢাকা থেকে*

অভিনয়

-এম.এইচ রশীদ ঝিলন

আমার এ লেখা যদি যাযাদির *ভালোবাসা* সংখ্যায় স্থান পায় তাহলে আমার স্ত্রী আমাকে নতুন করে ভাবতে শুরু করবে। যদিও এর সম্ভাবনা ক্ষীণ। সাধারণত আমি বা আমরা যে কলুষিত সমাজে বাস করি সেখানে প্রতিনিয়ত মিথ্যা, প্রতারণা, সংগ্রাম করেই বাচতে হয়। জীবন ধারণের জন্য যেমন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান দরকার তেমনি এগুলো ধরে রাখার জন্য ব্যক্তিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, পাকা অভিনেতা হতে হয়। অভিনয় করতে, ছলচাতুরি, মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য অভিনয়, বন্ধু–বান্ধব এর সঙ্গে অভিনয়, পাড়ার মাস্তানভাইদের সঙ্গে অভিনয়, এমনকি ব্যবসা–বাণিজ্যেও আমাকে অভিনয় করতে হয়।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে অভিনয়ের মাত্রা প্রকাশ পাবে। সকালবেলা যখন স্ত্রী বাজারের ব্যাগ হাতে দিয়ে বলে, মাছ নেই, তরকারি নেই, ডাল নেই, গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। এসব লাগবে। তখন আমার অবস্থা ত্রাহি ত্রাহি। আমার কাছে যে টাকা নেই, মাসের শেষ তা স্ত্রী একদম বুঝতে চায় না। কি আর করা? বাজারে মাছ কিনেছি চড়া দামে। বাসায় গিয়ে বলি কম দামে। এখানে একটু অভিনয় করি। কারণ, প্রকৃত মাছের দাম বললে স্ত্রী বিশ্বাস করবে না।

নতুন শহরে এসেছি। ভাড়াটিয়ার বাসায় থাকছি। বিভিন্ন সময় পাড়ার মাস্তানদের বখরা দিতে হয়। প্রতি মাসে তাদেরকে টাকা দিতেই হয়। শুধু তাই নয়, পথে–ঘাটে যখন তাদের সঙ্গে দেখা হয় তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে কুশল বিনিময় করতে হয়। সুতরাং এখানে অভিনয় করতেই হয়।

আমার কুশলাদি জানতে কেমন আছেন এর উত্তরে আমার মন খারাপ হলেও *ভাই, ভালো আছি* বলতে হয়।

বন্ধু প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, সেই দিন আমার ব্যবহার করা হন্ডা আমার অল্প কয়েকদিনের পরিচয় বন্ধু একদিনের জন্য ধার চাইলো।

তখন সরাসরি না বললে সে মাইন্ড করতে পারে। তাই তাকে অভিনয় করে বললাম, আমার হন্ডা নষ্ট, গারাজে রেখে এসেছি।

সহজভাবে সে বিশ্বাস করলো। এভাবে বন্ধু মহলেও আমাকে অভিনয় করতে হয়।

যেহেতু ছোট্ট একটা ব্যবসা করি, তাই কাস্টমারকে আপা, ভাবী, ভাই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করে থাকি। ক্রেতা যখন কোনো জিনিস আমার দোকানে কিনতে আসেন তখন খুব টেকনিকভাবেই দাম একটু চড়া করে চাই। প্রকৃত দাম বললেও ক্রেতা বিশ্বাস করবে না। তাই একটু বাড়িয়ে দাম হাকাতে হয়। আবার দাম দরাদরি না করে ক্রেতা মাল কিনতে চান না। তাই...। এখানে *সেলিং টেকনিক* নামে অভিনয় করে আমাকে ব্যবসার কাজ পরিচালনা করতে হয়। তাই ব্যবসার কাজেও অভিনয় জড়িত।

তবুও মাঝে মধ্যে ভাবি কি চাওয়া ছিল, কি পাইনি। যখন স্ত্রীর কাছে অভিনয় করি তখন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মাঝে মধ্যে ধরা খেয়ে যাই। সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করি।

তখন স্ত্রীও একই সুরে বলে, এভাবে অভিনয় না করলেই পারতে।

বিশ্বাস ও ভালোবাসা জগৎ সংসারে একই সুতায় গাথা। এই কথা মানতে কষ্ট হয় স্ত্রীদের।

সেই দিন স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ি কিনেছি। দাম যখন জানতে চাইলো তখন প্রকৃত দামটাই বললাম।

কিন্তু প্রাণপ্রিয় স্ত্রী আমার কথা বিশ্বাস করলো না। কি আর করা! নিশ্চয়ই আগের মতো অভিনয় করে বললে বিশ্বাস করতো।

আসুন, আমরা সবাই অভিনয় করি। কারণ, বৌ খুশি তো সবাই খুশি।

ভোলা সদর থেকে

সার্টিফিকেট

প্রিয় মা,

তোমার কাছে লেখা এটাই আমার শেষ চিঠি। চিঠিটি যখন তোমার হাতে পৌছাবে তার আগেই হয়তো হেরোইন পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত আমাকে ফাসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। আর কোনোদিন তোমাকে মা ডাকা হবে না আমার।

মূলত আমি আরো অনেক আগেই মরে গিয়েছিলাম মা। বেকারত্বের কাফনে ঢাকা আমার এই দেহটিকে তোমার সে সময়ে লাশ বলে মনে হয়নি। কারণ, তুমি হয়তো মনে করেছিলে, তোমার শিক্ষিত ছেলে আর বেশি দিন বেকার থাকবে না। ভুল ছিল মা তোমার সেদিনের ভাবনা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এই দেশে মেধা ও শিক্ষার চেয়ে টাকা এবং টেলিফোনের কার্যক্ষমতাই বেশি।

তুমি হয়তো জানো না মা, চাকরির অ্যাপলিকেশনের সাথে ব্যাংক ড্রাফটের টাকা জোগাড় করতে দুলাভাইয়ের দেয়া ঈদের নতুন শার্টটি সেকেন্ড হ্যান্ড দামে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। বিনিময়ে ওরা আমাকে দিয়েছিল আশি পয়সা দামের অফসেট কাগজে ছাপা প্রহসনমূলক ইন্টারভিউয়ের কার্ড। সেদিন ওরা নিম্নমান অফিস সহকারি পদের ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাসিনা আর খালেদার মধ্যে কে বেশি জনপ্রিয়? তুমিই বলো মা, আমি কাকে জনপ্রিয় বলবো! একজন কথা খেলাপি। কাজের চেয়ে কথা বেশি বলে। সংসদ ছেড়ে জীবন জিম্মি করে দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে। আরেকজন ক্ষমতার আড়াই বছরেও সন্ত্রাস দমন করতে পারেনি। এখনো প্রতিদিন গড়ে দশজন লোক খুন হয়। নাগরিক জীবন ভীত–সন্ত্রস্ত।

শেষে আমার দেয়া উত্তর ওদের পছন্দ না হয় এই ভেবে তাদের করা প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছিলাম বলে তারা আমাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছিল। তবু আমি দমে যাইনি মা। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে চাকরির জন্য একের পর এক অ্যাপলিকেশন করেছি। চাকরির খোজে ক্লান্ত হয়ে কখন যে নিজেকে অন্ধকার জগতের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিয়েছিলাম তা বুঝতেই পারিনি। এখন জীবন দিয়ে সেই ভুলের খেসারত দিতে যাচ্ছি।

মা, টুই যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আমার কথা জানতে চায় তবে ওকে বলো, আমি তাকে বড় বেশি বিশ্বাস করতাম। বলো, মৃত্যুর আগে যতোগুলো টাকা রেখে গেছি তা দিয়ে এক ডজন ইঞ্জিনিয়ার কেনা যায়।

আর একটা কথা মা। আমার মরণোত্তর শেষ ইচ্ছাও বলতে পারো। তা হলো, আমার পনেরো বছরের কষ্টার্জিত স্কুল–কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, তাদের দেয়া সার্টিফিকেট আমাকে একটি চাকরির নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

নাম ঠিকানা বিহীন

শিমুলতলী

বছর পার হয়ে আবারও একটি শৈত্য প্রবাহের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে হচ্ছে আমাদেরকে। প্রকৃতির এ রুক্ষতাই আমার মনকে আবেগ প্রবণ করে তোলে। মনে করিয়ে দেয় গত শৈত্য প্রবাহের শিমুলতলীর সেই আবেগময় স্মৃতির কথা। ২০০১ সালের মাঝামাঝি পরিচয় হয় এক কর্মজীবী মহিলার সঙ্গে। পেশায় ছিলেন সিনিয়র স্টাফ নার্স। স্বামী প্রবাসী। হাসপাতাল কোয়ার্টারে অন্য সহকর্মীর সঙ্গে থাকেন। মোটামুটি সুন্দরীই বলা চলে। ব্যবসায়িক কারণে মাঝে মধ্যে আমাকে হাসপাতালে যেতে হতো।

একদিন লক্ষ্য করলাম ডিউটি রুমে নেশা জাতীয় ইনজেকশন পুশ করে দেয়ার জন্য একটি ছেলে উত্যক্ত করছে তাকে। আমাকে দেখে ছেলেটি পালিয়ে গেল। ভদ্রমহিলা বললেন, বাচালেন। এসব ছেলেদের সামাল দিতে খুবই কষ্ট হয়। এই উপকারটুকু করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আপনার পরিচয়টা দিলে খুশি হবো।

কেন জানি তাকে দেখে এবং তার কথা বলার ঢঙয়ে মনের মাঝে হোচট খেলাম। বললাম, হাসপাতালের অন্য নার্সদের চেয়ে আপনি একটু ব্যতিক্রম। এ কাজে ছেলেগুলো সুন্দরী মেয়েদেরকেই বেশি উত্যক্ত করে। সুতরাং এই ছেলেদের থেকে সাবধান থাকবেন। তাকে পরিচয় দিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন পর সেসহ আরো দুজন নার্স আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এসে বললেন, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বেশ কয়েক মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছি না। আপনি যদি এ ব্যাপারে একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখতেন তাহলে উপকৃত হতাম। তাদের চা-নাশতায় আপ্যায়ন করে বিদায় দিয়ে বললাম, আমার পক্ষে যতোটুকু সম্ভব চেষ্টা করবো।

সেবা পরিদফতর থেকে একটি অর্ডার এনে তাদের বেতনের ব্যবস্থা পরের সপ্তাহেই করে দিয়েছিলাম।

এর কয়েকদিন পর রেবা নামের সেই প্রথম পরিচিত নার্স আমার বিআরডিবি অফিসে এসে বললেন, চেয়ারম্যান সাহেব একটু সময় করে কাল যদি আমাদের বাসায় এসে ইফতার করেন তবে খুবই খুশি হবো।

পরদিন তার বাসায় গেলাম তার আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচিত হলাম। অনেক কথা হলো তার সঙ্গে।

বিদায়ের সময় তিনি বললেন আগাম নিমন্ত্রণ দিয়ে রাখলাম, আপনার শত ব্যস্ততার মাঝেও যদি এভাবে এসে একটু সময় দেন তবে খুবই খুশি হবো।

তারপর অনেকবার গেলাম তার বাসায় তিনিও প্রায়ই আমার অফিসে আসতেন। এই আসা-যাওয়ার মাঝে কেমন করে যেন দুজন দুজনার কাছাকাছি হয়ে গেলাম।

হঠাৎ একদিন তিনি এসে বললেন, জরুরি প্রয়োজনে ঢাকা ও গাজীপুর যেতে হবে। যেভাবেই পারেন একটু সময় করে আমার সঙ্গে চলেন।

কাজ কর্ম গুছিয়ে দুদিন পর তাকে নিয়ে ঢাকা গেলাম।

সেবা পরিদফতরে তার কাজ করতে গিয়ে আমার এক পরিচিত অফিসারের মুখোমুখি হলাম। দেখে বললেন, চেয়ারম্যান সাহেব, ভাবীকে আবার নার্সের পেশা দিলেন কবে?

এ কথায় একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

তিনি আমার কানে কানে বললেন, ভদ্রলোকের ভুল ভাঙানোর দরকার নেই।

তারপর কপোত-কপোতীর মতো দুজন ঘুরলাম। এক সময় বললাম, ওই সময় ওই মিথ্যা অভিনয়টুকু না করলে কি হতো না?

তিনি বললেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী সেটা মিথ্যা। কিন্তু এই সারাটা দিন স্বামী-স্ত্রীর মতো যে আবেগময় মুহূর্তটুকু দুজন উপভোগ করছি সেটা কি মিথ্যা? জীবনের অনেক সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে পরিস্থিতি বাধ্য করে। আমরা তারই শিকার। এ নিয়ে অস্বস্তি বোধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আবেগ ভরা কণ্ঠে বললাম, রেবা, আর যদি পাচ বছর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হতো তবে হয়তো মিথ্যা অভিনয়টুকু করতে হতো না। কিন্তু আজ কি তা সম্ভব? কি হবে মিথ্যা অভিনয় করে! এর পরিণতি বা কি হবে?

বললো, তোমার এই অভিনয়টুকু যদি আমার বুভুক্ষ হৃদয়ে আত্মতৃপ্তি দেয় তাহলে এটুকু কি তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি না?

কথার মাঝে কখন যে তুমিতে এসে গেছি আবেগের কারণে কেউ তা বুঝতে পারিনি।

বললাম, রেবা, সন্ধ্যা হয়ে এলো, প্রচণ্ড শীত, চলো রওনা দিই। ট্যাকসি ক্যাবে বসে তোমার সব কথা শুনবো।

গাজীপুরের শিমুলতলীর উদ্দেশ্যে ট্যাকসি ক্যাবে রওনা দিলাম।

পথে সে তার জীবনের সব কথা বললো। কেমন করে ছোটবেলা থেকে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বড় হয়ে এই নার্সিং পেশায় এসেছে। আত্মীয়দের চাপে অনেকটা বাধ্য হয়ে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়েছে। পেশাগত কারণে তার স্বামী তাকে সহজভাবে নিতে পারেনি। স্বামীর কাছে অবহেলা, অনাদর ও যোগ্য ভালোবাসাটুকু সে পায়নি। স্বামীর শুধু তার টাকা ও চাকরির দিকেই নজর ছিল বেশি। আবার প্রবাসী হওয়ার কারণে তাদের মাঝে দূরত্বটাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

আমাকে বললো, স্ত্রীর অধিকার তোমার কাছে কোনোদিন চাইবো না। কিন্তু যে আবেগ ও ভালোবাসার পরম সুখ আমাকে দিয়েছো তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

বললাম, আমার সামাজিক অবস্থা কি আমাদের এই অবৈধ মেলামেশা কি মেনে নেবে?

সে বললো, তুমি যেন সামাজিকভাবে হেয় না হও সেদিকে লক্ষ্য রেখেই চলবো। আজ ঢাকা এসেছি শুধু তোমাকে কাছে পেয়ে মনের এই ব্যথা তোমাকে বলে একটু হালকা হবো। তুমি হয়তো আমাকে ব্যভিচারিণী ভাববে।

প্লিজ লক্ষ্মীটি, এমনটি করো না। ওই দিন শৈত্য প্রবাহে রাতে সে আরো আমার কাছে এসে মিশে গেল। আমিও আমার শরীরের উষ্ণতা দিয়ে তাকে ঢেকে দিলাম। শিমুলতলীর তার বাসার আত্মীয়রাও আমাকে সহজভাবে মেনে নিল।

ছায়া ঘেরা শিমুলতলী নামের সেই ছোট্ট জনপদটি আমার ভালোবাসার সঙ্গে মিশে গেল। যখন দুজন সময় করতে পারতাম তখন ছুটে যেতাম শিমুলতলীতে। নদী যেমন সাগর সঙ্গমে মিলিত হওয়ার জন্য পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে ছুটে যায়, কোনো বাধাই তাকে রুখতে পারে না তেমনি আমরা ছুটে যেতাম শিমুলতলীতে। সমাজ-সংসার কোনোটাই আমাদেরকে রুখতে পারেনি।

একদিন বললাম, তোমার স্বামী এলে কি করবে?

সে বললো, তোমার ঘাড়ে তো আর ঝুলে পড়বো না? স্বামীর ঘর যদি নাও করি, নিজকে তো গুছিয়ে রাখতে পারবো। পরিস্থিতি বলে দেবে কি করবো।

তাকে বললাম, যায়যায়দিনের ৪৬তম সংখ্যায় শিমুল চৌধুরীর লেখা সুতা কাটা ঘুড়ি-র মতো আমাকেও বলতে হবে না তো, সুতা কাটা ঘুড়ি ফিরে পেয়েছে তার আকাশের মানুষকে।

জনৈক চেয়ারম্যান, নাম ঠিকানা প্রকাশ অনিচ্ছুক

আকর্ষণ

চার দশক আগের পরিচয়ের সূত্র ধরেই তার বাসায় বেড়াতে যাওয়া। সৌম্য দর্শন, ছিপছিপে পাতলা দেহ গঠন, শাদা পাঞ্জাবিতে আমার কাছে তাকে অপূর্ব লেগেছিল। চশমার আড়ালে তার চোখের অবাক করা চাউনিতে আমি কি সেদিন যৌবনের শেষ রশ্মির ঝিলিক দেখতে পেয়েছিলাম? জানি না। তবে কি এক অজানা আনন্দের শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। বহুযুগের ওপার হতে বিরহী এক বাশির অনির্বাচনীয় সুর মূর্ছনায় আমার চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এ চোখ আমার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা। আমি যেন এরই জন্য যুগ-যুগান্তরের পথ হেটেছি।

মাঝে মধ্যে তাকে খুব মনে হতো। ক্ষণিকের দুর্বলতা বলে এর বেশি আর কিছু মনে ঠাই দিইনি। শেষ বয়স। নাতি-নাতনির ভরা সংসারে এসব এখন মানায় না।

দাম্পত্য ভালোবাসায় প্রেমের কারুকাজ না থাক তবে স্বামী আমাকে কখনো অযত্ন করেনি। আমার চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার অনেক অমিল ছিল। তার সঙ্গে মতে এবং পথেও ছিল দুস্তর তফাত। জীবন চলার পথে মনন-

মানসিকতায় আমরা দুজন দুমেরুর বাসিন্দা। তবুও সেই যে ষোল বছর বয়সে বিয়ে করে বিয়ের তিন বছরের মাথায় দুই সন্তানের জননী হয়ে সংসারকে আগলে ধরেছি। নিজের মনের দিকে তাকানোর আর অবসর হয়নি। তবে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার এতো অমিল দেখে মাঝে মধ্যে অন্তরে বড় কষ্ট হতো।

বই পড়ার নেশা ছিল বলে সন্তান বড় হওয়ার পরেও এক সময় স্বামীর আগ্রহে ও নিজের মেধায় এমএ পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করেছি। একটা চাকরিও করি। পরে মনে হয়েছে লেখাপড়াটা না করলেই ভালো হতো। বোধের সঙ্গে বুদ্ধির সমন্বয়ে জীবনের জমা–খরচের হিসাবটা বড় বেশি গোলমেলে মনে হয়।

অহংকার করার মতো আমার অনেক কিছুই ছিল। তবুও অনেকের মাঝে অনন্য হতে পারিনি। বার বার ঘুরে–ফিরে মনে হতো স্বর্ণালি যৌবনের উন্মাতাল আনন্দ সে আমার ছিল কি? অন্তরে কিসের যেন হাহাকার টের পেতাম। এতো রূপ, রস, ছন্দ, আনন্দের বর্ণালী ধরণী বড় বেশি ফিকে ধূসর মনে হতো। খোলা জানালায় দাড়িয়ে মনের শূন্যতা আর আকাশের শূন্যতা যেন একাকার হয়ে যেতো।

সাহিত্যের ছাত্রী বলে কবিতার ছন্দে অন্তর দোলে। গল্প আর গানের ঐন্দ্রজালিক মায়াময়তায় হৃদয় মোহাবিষ্ট হয়।

স্বামীর সঙ্গে এসব আনন্দের শেয়ার করতে গিয়ে হতাশ হয়েছি। তার কাছে এসব ভাবাবেগ অর্থহীন ছেলেমানুষি। মনের মাঝে বঞ্চনার একতারা বাজে। হাটি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, জোড়া দীঘির ঘাট পেরিয়ে। আজ মনে হয়, এই পৃথিবীর পথে–প্রান্তরে ত্রিশ বছর ধরে একা হেটেছি। আমার হাতে কারো হাতে ছিল না। দেহের পাশে হয়তো দেহ আছে, মনের পাশে কেউ ছিল না। আমি বড় একা, একেলা।

চোখ বন্ধ করলেই নিঃসঙ্গতার বাউড়ি বাতাস আমাকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। মনের মাঝে অসংখ্য কথা বুদবুদের মতো ফেনিয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

একদিন তার ফোন পেলাম। হাড়িতে ভাত ফোটানোর বলকানির মতো কেন যে মনটা টগবগ করে উঠলো তা জানি না।

কথা হলো। কথায় কথায় কথা বলার নেশা হলো। মনে হলো এ যেন সেই রূপকথার রাজপুত্র, সোনার কাঠি–রূপোর কাঠির ছোয়া দিয়ে আমায় যেন জাগিয়েছিল। মানুষের মুখের কথায় এ মধু! যতোই শুনি ভালোলাগার জাদুর ছোয়ায় তন্ময় হয়ে যাই। জাগতিক, পারলৌকিক থেকে শুরু করে সাহিত্য, দর্শন, জীবন বোধ, কামনা–বাসনার কতো যে বৈচিত্র্যময় কথামালা। আমি মুগ্ধ হই।

তার কণ্ঠে প্রিয় কবিতার আবৃত্তি শুনে অসীম ভালোলাগায় নিমগ্ন হয়ে যাই। এসব শুনে শুনে কখন যে অন্তরের অতল গভীরে তার অনিবার্য উপস্থিতি প্রোথিত হয়ে গেল জানি না। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণ কাব্য পড়ে অবচেতন মনের মাঝে অমন ঐশ্বরিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। রবি ঠাকুরের *জীবন দেবতা* সেও আমার অন্তরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করতো। মনের মাঝে অমন ভালো লাগার অস্তিত্ব প্রবলভাবে কামনা করতাম। কবিতাকে ভালোবেসে কতো যে হেসেছি, কেদেছি?

একদিন তার সঙ্গে দেখা হলো। বুকের মাঝে আগেই ধুকপুকানি ছিল। জানি না, সেদিন বাতাসে কিসের গন্ধ ছিল, কি গান গেয়েছিল পাখি, কি রঙ লেগেছিল আকাশের গায়ে! আমার সবটুকু আমিত্ব তার মাঝে হারিয়ে আমি কি শ্রেষ্ঠ ধনী হলাম, নাকি পথের কাঙাল হলাম জানি না। তবে বুঝতে পেলাম আমার প্রতি তার অকৃত্রিম মমত্ব বোধ, অনুভূতির প্রগাঢ় উষ্ণতা আমাকে মাকড়সার জালের মতো নিবিড় বন্ধনে জড়িয়েছিল।

দিন যায়, তাকে আমি বুঝি। তার চিন্তা–চেতনা, ভালোলাগা, ভালোবাসায় আমার সঙ্গে এতো মিল! আমি অবাক হই। তার রুচিশীল পোশাক–পরিপাট, স্বভাব সুলভ আচার–আচরণ, সমাজ চেতনা, জীবন দর্শন, পরিবেশ সামাল দেয়ার সুচারু কৌশল আমার ভীষণ ভালো লাগে। তার চারিত্রিক ঋজুতা, অন্তরে–বাইরে

অমন অফুরান প্রাণ শক্তি, সর্বোপরি তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের বর্ণালী চ্ছটা আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। পেশার বৈপরীত্য সত্ত্বেও তার মননশীল সাহিত্য চর্চা, শিল্প ভাবনায় বিমুগ্ধতার অতলান্তে তলিয়ে যাই।

তার সঙ্গে দেখা হলে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে চায়, বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসে। তার চোখের দিকে তাকাতে পারি না। মনে হয় আমার সেই ষোল বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন, কৈশোর যৌবনের থমকে যাওয়া আশা–আকাঙ্ক্ষাগুলো যেন কোনো সঞ্জীবনী সুধার ছোয়ায় নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে। আমার ধমনীর রক্ত প্রবাহে তার উপস্থিতি টের পাই। কূল ভাঙা ঢেউয়ের ব্যাকুলতায় তার বুকের মাঝে আছড়ে পড়তে মন চায়। তার বুকের সুধা, মুখের মধু আকণ্ঠ পান করে দেহে মনে মিশে যেতে বড় বেশি সাধ জাগে। বহু বর্ষের বঞ্চিত আত্মার সুতীব্র হাহাকার বাস্তবের বেদীমূলে বিসর্জিত হয়।

কিন্তু সমাজ সংসারের বেড়াজাল ছিন্ন করার দুঃসাহস আমার কোনোদিন হবে না। সংসারের আগল ভাঙা! সে কোনোদিনই সম্ভব নয়। শুধু জানালা গলিয়ে ঘরের ভেতরে ভেসে যাওয়া জোছনার মতো তার ভালোবাসা অঙ্গে মেখে আমৃত্যুকাল অপেক্ষা করবো।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সাম্যবাদী

–অর্জুন

জানুয়ারি ২০০০ সাল। ঢাকায় তখন ক্লাসিক–এ কোচিং করতাম, থাকতাম শুক্রাবাদে। এর সম্মুখেই সোবহানবাগ সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার। সেখানে থাকতো সেই পাগলি যাকে নিয়ে এ লেখা।

একদিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে চোখ পড়লো এক সপ্তদশীর।

হঠাৎ করে বললো নিচে আসতে।

কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। সবেমাত্র এইচএসসি পাস করা এক যুবক। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলাম এবং দেখা করলাম। আমার বিস্তারিত সে জানলো আমিও শুনলাম এবং বললাম এই মুহূর্তে আমার অন্য কিছু ভাবার সময় নেই।

সে বললো, আপনি যতোদিন বলবেন ততোদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কিছু না বলেই চলে এসেছিলাম।

কিছুদিন পর বিকেলে হাটতে বের হয়েছি।

তা দেখেই সে তার চাচাতো ভাইকে নিয়ে রাস্তায় চলে এসেছে। চাচাতো ভাইয়ের বয়স চার পাচ বছর হবে।

হঠাৎ করেই পেছন থেকে ডেকে বললো, কেমন আছেন?

ও, তুমি! ভালো আছো?

ভালো আর রাখলেন কই?

কেন, আমি আবার কি করলাম?

আপনি অনেক কিছু করছেন। সব বলবো, তবে দাড়িয়ে নয়। কারণ দাড়িয়ে কথা বললে সবাই বুঝে ফেলবে। আপনি আগে আগে হাটবেন আর কথা বলবেন, আমি পেছনে থাকবো।

পেছনে হাটতে হাটতে বললো, শুনুন, আমি চাচার বাসায় থাকি। চাচা সচিবালয়ে চাকরি করেন। বাবা সরকারি আইনজীবী। আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে। আগামীকাল সকাল দশটায় আপনি মেইন গেটে আসবেন। পারলে আগে জানালা দিয়ে ইশারা করবেন। তারপর গেট থেকে রিকশায় সংসদ ভবনে যাবো। আর কোনো কথা বলবেন না। চললাম।

বেকুব হয়ে গেলাম। এই বয়সে মেয়েদের প্রতি কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। আমার ক্ষেত্রেও তাই।

নির্ধারিত দিনে রিকশা নিয়ে যথাস্থানে এসেই বললো, রিকশায় ওঠেন।

রিকশায় পায়ের ওপর পা তুলে চুপ করে রইলাম।

শুনুন, ভয় পাচ্ছেন?

কই না তো?

তবে এদিকে সরে আসুন।

মনে মনে বললাম তথাস্তু।

রিকশাচালককে সে বললো, লালমাটিয়া হয়ে সংসদ ভবনে যাবো।

বললাম, কেন?

অনেক অনুরোধে সে বললো, আমার বান্ধবীরা আপনাকে দেখতে চেয়েছে।

আমি তো তখন নবাব শাহজাহান। সংসদ ভবনে যখন পৌছালাম তখন বেলা এগারোটা।

ব্যাগ থেকে ওড়না বের করে পাম গাছের নিচে বিছিয়ে বসার জন্য বললো।

শিউলিও গা ঘেষে বসলো। তার শরীরের অনেক অংশই আমাকে স্পর্শ করছিল আর প্রথম কোনো নারীর পরশে আমার সমস্ত শরীর কেপে উঠছিল।

হঠাৎ করেই সে একবার আমায় জড়িয়ে ধরেছিল।

কি করবো বুঝতে পারছিলাম না।

বললাম শোনো, ঠিক হয়ে বসো। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো।

সে বললো, বলেন।

শোন তুমি মুসলমান আর আমি হিন্দু। ব্যাপারটা ভেবে দেখো।

আমি আর কিছু জানি না। আমি জানি, আমি একজন মানুষ, আপনিও একজন মানুষ। এই আমার শেষ কথা।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম, শিউলি, তোমার কাছে একটা মূল্যবান জিনিস চাইবো, দেবে?

থাকলে দেবো। বলেন কি নেবেন?

বললাম, একটা কিস দেবো।

দেন।

আমি যেখানে চাইবো সেখানে দিতে হবে।

সে রাজি হলো।

বললাম, ভেবে দেখো।

যা চাইবেন তা-ই হবে।

বস্তুত কথাটা বলেছিলাম আমার প্রতি তার ভালোবাসা এবং বিশ্বাস কি রকম তা বোঝার জন্য। কিন্তু পড়ে গেলাম সমস্যায়।

হিজল গাছের আড়ালে দাড়িয়ে সে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, কই দেবেন না, কোথায় কিস দেবেন, দেন।

শেষ পর্যন্ত এক লোক চলে আসায় সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। এরপর মেস বদল করে চলে যাই জগন্নাথ হলে। সেখান থেকে খুলনা। এখন আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র। কিন্তু তার সেই অবুঝ হৃদয়ের সাম্যবাদী ভাষা *আপনিও একজন মানুষ* আজও প্রমাণ করতে পারিনি।

খুলনা থেকে